যুগপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের পঞ্চসপ্ততিতম শুভ জন্মজয়ন্তী স্মরণে

ভাবমুখে

শ্রাবণ • ১৩৯৯ বাংলা • ত্রিংশৎবর্ষ • শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম • সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ের
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী কটক ধানবাদ পাটনা শিলিগুড়ি গৌহাটী

●

DE LUX

ORPHAN'S TEA

For

Health & Economy

ORPHAN TEA SYNDICATE

133, Cornwallis St. Shyambazar

Phone : 55-2704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CAL. 6
PHONE : 34 - 3711

★

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি:-৬

শ্রীশ্রীসত্যানন্দ
শ্রাবণ : চতুর্থ সংখ্যা

সুধা সরস্বতী

অষ্ট ভারতী
ত্রিংশৎ বর্ষ : তেরশ' তিরাশি

গান	শ্রীশ্রীঠাকুর
আচণ্ডালের ঠাকুর	শ্রীঅর্চনাপুরী
ক্ষমা কোরো হে দেবতা	শান্তি দেবী
শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রসঙ্গে	শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
হোম বধ ও যুধিষ্ঠির	শ্রীসুধীন্দ্র নাথ রায়
ওগো বন্ধু বলাকা	স্বামী অরূপানন্দ
দুরন্ত শ্রাবণে	শ্রীশরণাপুরী
একেক দিন	শ্রীসুধেন্দু মল্লিক
শ্রীঅরবিন্দ	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর)
রসো বৈ সঃ	আরতি
দ্বারাবতীর ডাক	আরাধনাপুরী
একতারা	শ্রীপ্রভাত কুমার চক্রবর্তী, এম এ., বি. এল.
শ্রীম[illegible]	স্বামী মৃগানন্দ
অচিন কবিতা	স্বামী হীরানন্দ
মা	শ্রীদুর্গাপদ সরকার
সাধক কমলাকান্তের ভজন স্থান দর্শন	শ্রীসতীশ চন্দ্র নাথ
রামানুজ কথা	শ্রীরাধাবল্লভ দে
প্রাচীন ভারতে রসায়নী চিন্তা	শ্রীরাখাল কৃষ্ণ আচার্য
কর্মশিক্ষা শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র	
World Psychology	Sreemat Swami Satyananda Dev
What I Want [English rendering of Sri Archanadpri's Bengali poem "Kee Chai"]	21 Sri Jyotsna Nath Mallik
Art and Life	22 Bhaskar Acharya

• আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : ভাদ্র, ১৩৮৩

১৭ই আগষ্ট	১লা ভাদ্র	মঙ্গলবার	—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী (গোস্বামী মতে পরাহ্নে)
২১শে	৫ই	অনিবার	—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
২৩শে	৮ই	মঙ্গলবার	—রাত্রে অমাবস্যার হোম।
২৪শে	৯ই	বুধবার.	—অমাবস্যার ব্রতোপবাস।
১লা সেপ্টেম্বর	১৬ই	বুধবার	—শ্রীরাধাষ্টমী।
৩ঠা	১৯শে	শনিবার	—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৮ই	২৪শে	বুধবার	—পূর্ণিমার হোম।
৯ই	২৫শে	বৃহস্পতিবার	—পিতৃপুরুষের তর্পণ আরম্ভ।
১৬ই	৩১শে	বৃহস্পতিবার	—বিশ্বকর্মা পূজা।

• বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

PHONE : Office : 24-1236
Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS

4, Hartford Lane, Calcutta-16
Works 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

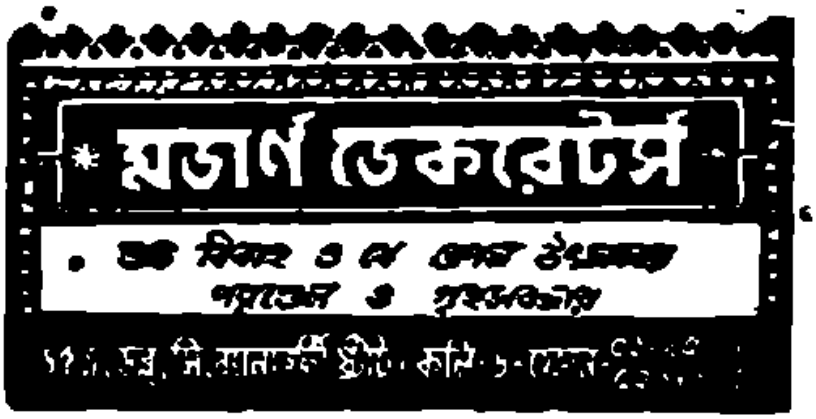

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী

করুণাবতার

শ্রীশরণাপুরী মূল্য : ১১·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি—৩৬

নূতন দিগন্তে

দেবব্রত বিশ্বাস

সঙ্গীত জগতে নূতন অবদান

দিব্যগীতি

রচনা

মহাসাগরের ডাক শুনেছি যে
বেলাশেষের বাঁশী ওগো } স্বামী সত্যানন্দ

অনেক রক্ত ঝরেছে মাটির বুকে
আলোর চোখের আলো } শ্রীঅর্চনাপুরী

সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায়
শ্রীপ্রবীর মজুমদার

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্-এর
45 R. P. M. এক্সটেণ্ডেড প্লে রেকর্ড
25242/25243 LH 163
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ পি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৩৬—এখানেও পাওয়া যায়।

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA, CALCUTTA-56

Phone :

ফোন : ৩৪-৭১৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺যাদবপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

—•:০:•—

৮৮ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

॥ স্বত্বাধিকারী ॥
রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS
OF
ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

Head Office :
N. G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 47-5248

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah. (*West Bengal*)
Telephone : 66-4843

ভাবমুখে

দ্বিতীয় বর্ষ | তেরশ' তিরাশি | শ্রাবণ | চতুর্থ সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

অম্বরে মেঘ কজ্জল
উছসিত আজি ক্ষণে ক্ষণে
ভরা কূলে নদী কূল হারা
শত কথা এই মনে মনে ॥
গন্ধ গহন সম্ভরি
ফুটেছে অধীর মঞ্জরী
ছায়া নামা এই বনে বনে ॥
চাহিতে আঁধার দূর পানে
পথিক মন নাহি মানে
নিভৃত নিশিথ কাণ্ডারী
জীবন মরণ মন্থরি
নেবে কি ধ'রে পথ জনে ॥

আচণ্ডালের ঠাকুর

শ্রীঅর্চনাপুরী

বাবা গো চাঁড়ালি মুই" টলালে: অটল জগন্নাথের রথ
পেয়েছি এ কথা কবির লেখনী মুখে
গাময়া দেখেছি সচল জগন্নাথে
রাজজলা প্রাতে ছুটে যেতে এক ধাওড় পাড়ার পথে
দেখেছি সে-রূপ বাস্তব এই চোখে।
াতিকার গ্রাম সহসা সে হ'ল ভগবৎ লীলাপীঠ
ব্রহ্ম নদীয়ার আনন্দ সঙ্গম
াত্যানন্দ গোরাচাঁদে ঘেরি অলখে বাজিল বেন
লোচনের খোল, আর মধুময় শ্রীবাসুর কীর্তন।
গারাদিনরাতে বিরাম মানে না কেহ
ছোটে নরনারী বয়সের ভেদ ভুলি
ামাকীর্তনে যমুনার জলে নাম তরঙ্গ ওঠে
'ওঠরে ওঠরে ধনীমাঈ ধন জাগোরে নয়ন মেলি'।
এমনি সেদিন সোনার সকাল আলো ঝলমল বেলা
ভোরের শিশির শুকায়ে এসেছে তবু আধো ভিজে ধূলি
ঘাটে চরা বেনু ঊর্ধ্বমুখেতে চায়
নাম শ্রবণে কি যেন শুনিছে কি যেন দেখিছে
সজল দৃষ্টি তুলি।
লেছেন প্রভু রায়
শ্রীরামকৃষ্ণ নামকীর্তনে মুখরিয়া দিকদেশ
শত ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিছে সে মহানাম
মুছে গেল যেন সারা বিশ্বের রজনীর ম্লান ক্লেশ।
সহসা কি হ'ল মনে
থামি কীর্তন ছুটিলেন প্রভু পথ ছেড়ে আনপথে
কণ্টক আর আবর্জনায় ছেয়ে আছে যার ধূলি
ভক্তের দল হানিল নিষেধ কেবা শোনে কার কথা
ছুটিছেন প্রভু কি যেন সে টানে দিক বেশ সব ভুলি।
ভক্তের দলও নিরুপায় হ'য়ে ছুটিল তাঁহার পিছে
গগনে বাড়িছে বেলা
আলুথালু বেশে ছুটিছেন প্রভু অঙ্গে ঝরিছে স্বেদ
বোঝেনাকো কেহ সহসা এ কোন খেলা।
পথ ছেড়ে হায় ঢুকিলেন শেষে আসি
ভক্তের দল নাসিকা বস্ত্রে ঢাকে
ক্লীন্ন শীর্ণ কুটিরের সারি চরিছে শূকর পাল
পুতিগন্ধের প্রভাবে বাতাস আবরিত হ'য়ে থাকে।
সরু সরু পথে ভাঙা বাটিয়ায় ধুঁকিছে কোথাও শিশু
দুটো বাসি ভাত তুলিতেছে কেহ মুখে
তেলহীন কেশ ধড়ি ওড়া দেহ অর্ধনগ্ন বেশ
বেঁচে আছে যেন শুধু বাঁচিবারই সুখে।
আশা নাই কোনও ভাষাহীন যেন মূর্ত মৃতের দল
তারাও উঠিল চমকিয়া সেই ক্ষণে
সেদিন প্রভাতে নূতন একটা প্রাণের আলোর রেখা
হানিল আঘাত পাণ্ডুর সে জীবনে।
কহিল ভক্ত ফিরে চল প্রভুহীন এ ধাওড় পাড়া
তোমার যোগ্য দেউল তো হেথা নয়
বারেক থমকি মৌন দেবতা আবার চলেন ছুটি
কি যেন আবেশে আঁখি দুটি তন্ময়।
ঢুকিলেন শেষে ভাঙা কুটীরের মাঝে এক কুটীরেতে
তত্ত্ব সবাই বুঝিতে পারে না কিছু
শুধু নীরবেতে অনুসরি তারে প্রবেশে সবাই বেথা
কি দেখি পুলকে সবার নয়ন শ্রদ্ধায় হ'ল নীচু।
নিকানো চুকানো সেই ভাঙা ঘর ধূপসুরভিতে ভরা
ছোট বেদী পরে সাজানো মূর্তিগুলি
ফুল চন্দনে পূজা প্রসন্ন মুখে হাসিছেন সুখে
বসিলেন প্রভু ধন্য করি সে ধূলি।

সবে জিজ্ঞাসে এ ঘর কাহার কিবা এ পরিবেশে
কে রচিল এই মেঠো পূজা ঘরখানি
আসে উত্তর—প্রভুর সেবক চৈতন ধাঙড়ের
এই দেবালয় সাধন ভজনে হেথা কাটে তার দিন
শুনি বিস্ময়ে ভক্তদলের মুখে না নিসরে বাণী।
নাম গানে ওঠে মুখরিয়া ঘর, ছুটে আসি দলে দলে
ধাঙড়ের দল দুয়ারে জমালো ভিড়
যার ঘর হায় সেই শুধু নাই গেছে আশ্রমে কাজে
দেবতা আসিয়া ধন্য করেন তার হীন মন্দির।
কিছুক্ষণ ধরে করি নাম গান শান্ত হ'লেন প্রভু
ধীরে বাহিরিয়া কুটীর দেউল হ'তে
ফিরে চলিলেন শান্ত চরণে নিজ আশ্রম পানে
চৈতন সাথে হ'ল সাক্ষাৎ ধূলি ভরা সেই পথে।
লুটায়ে পড়িল প্রভু পদমূলে ভক্ত সে চৈতন
আঁখিজল তার এই কথা যেন বলে
যে চাওয়াটি প্রভু বলিতে পারিনি মুখে
মনে মনে শুধু চেয়েছিনু নাথ এইটুকু কৃপা তব
অন্তর্যামী শুনেছিলে তাহা বসি এই হীন বুকে।
ঘরের মালিকও আমি নই প্রভু দেহের মালিকও নই
তাই আমিহীন এই হীন মন্দিরে
আপনি আসিয়া বসেছ হে দেব তুমি
এ দেহ ঘটেও তেমনি করিয়া হও হে অধিষ্ঠিত
অন্তর বীণে সদা যেন প্রভু নাহং মন্ত্র শুনি।
কাঁদিছে সেবক সজল নয়ন মোছে ভক্তের দল
স্তব্ধ দেবতা চৈতন শিরে রাখিলেন শুধু হাত
আচণ্ডালের ঠাকুরে হেরিয়া চমকিল ত্রিভুবন
মুখরি গগন ভয় দিল সবে ওঠে আনন্দ নাদ।

ক্ষমা কোরো হে দেবতা

শান্তি দেবী

বেদনায় বুক
যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে
সায়াহ্নের শেষ আলো নিভে গেল চিতার আগুনে।
জাগতিক কিছু লেন দেন
শোধ করে,
নিশ্চিন্ত আশ্বাসে বুক বাঁধি
অন্তহীন কুয়াসা আবৃত ধূসর সকালে
চকিতে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ডুবে
জানিনা কখন কিসে তীব্র ধাক্কা লেগে
মৃত্যুর বিকল ফাঁসে।
আহত পাখীর মত পড়ে থাকে
তারপর—, তারপর জীবনের সন্ধ্যা নেমে আসে
গোধূলি বেলার স্বর্ণলোকে
কেঁদে ওঠে অসীম আকাশ, কাঁদে স্মৃতিময় গৃহ
নির্জন নিস্তব্ধ একা একা
অনন্ত নিদ্রার সুখে লীন।
ক্ষমা কোরো হে দেবতা ক্ষমা কোরো
তোমার মধুর স্নিগ্ধ চরণের ছায়ে
মৃত্যুরে করি, অমৃতে উজ্জীবিত।

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রসঙ্গে

শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব তথা অন্যান্য সংসারত্যাগী মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে প্রায়ই একটি কথা আমার মনে হয়। তাঁরা গৃহত্যাগ করলেন কেন? কি তাঁদের দুঃখ? কি তাঁরা পেলেন না? কোন সে অসন্তোষ যার ফলে তাঁরা গৃহত্যাগ করে আর এক নতুন জগতে বসবাস আরম্ভ করলেন? এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের পলায়নবাদী বলে অভিহিত করেন। ঈশ্বর ও ধর্মের আড়ালে তাঁরা নাকি নিজেদের অক্ষমতাকেই ঢাকবার চেষ্টা করেন। আপাতদৃষ্টিতে সত্যানন্দদেব সম্বন্ধে এই ধারণা হতে পারে যে তিনি সামাজিক ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে স'রে গেছেন ইচ্ছে করেই। সংসারে থেকেও তো অনেক জনহিতকর কাজ করা যায়—তার শতসহস্র দৃষ্টান্তও আছে। তবে কেন তিনি এপথ ছেড়ে নতুন পথ বেছে নিলেন?

যতদূর জানি, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের জীবনে কোন প্রকার সামাজিক বা পারিবারিক অসন্তোষ ছিল না। ছিল না কোন প্রকার ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর পুত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী সত্যব্রত ভালো চাকরী করতে পারতেন, স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারতেন। পারতেন, কিন্তু প্রকৃতই কি সুখী হতেন? এমন মানুষও দেখা যায়, যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, ভোগৈশ্বর্যে জীবন যাপন করছে কিন্তু তার প্রাণে একটুও শান্তি নেই। তাঁর মনে বারবার প্রশ্ন ওঠে: এই সুখ, এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই ঐশ্বর্যই কি জীবনের চরম কাম্য? এর চেয়ে আর কিছু কি বেশী নেই পাবার? যথার্থ ধার্মিকের জন্ম অন্তরের গভীরতম অসন্তোষের অনুভূতি থেকে। আত্মিক অসন্তোষ থেকে আত্ম-জিজ্ঞাসা জন্ম নেয়। সত্যানন্দ দেবের জীবনেও এমন একটি অসন্তোষ, এমন একটি আত্ম-জিজ্ঞাসা জেগে ছিল বলে আমার মনে হয়। তিনি সত্যানুগতিক জীবনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। জাগতিক মায়া-মোহজালে হারিয়ে যাওয়া নিজের সত্তাকে খুঁজে পাবার জন্যে তাঁর প্রাণে জেগেছিল প্রবল ইচ্ছা। তিনি সেই দিব্য জীবনের খোঁজে নিজেকে নিয়োজিত করবার সংকল্প করলেন। শুধু সংকল্প করা নয়, আরম্ভ হোল কঠোর সাধনা, দুষ্কর তপস্যা। সত্যকে জানবার ব্রত নিলেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপন শেষে সত্যের সন্ধান তো পেলেনই, পেলেন আনন্দও। সত্যব্রত রূপান্তরিত হলেন সত্যানন্দে। কিন্তু এই পরমানন্দ একদিনেই মেলেনি। ভগবান রামকৃষ্ণ-শিষ্য অভেদানন্দকে গুরু বরণ করে কঠোর তপস্যার কান্তার মরু, দুর্গম গিরি অতিক্রম করে শাশ্বত শান্তি-পারাবারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে যে কল্যাণময় জীবনে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সেই জীবনের দ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে কোন রকম অসন্তোষ বা আর্তি নিয়ে, তিনি তাদের জীবনকেও ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছেন। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল:

তখন সিউড়ী আশ্রমের নির্মাণকাজ চলছে। মিস্ত্রি মজুর খাটছে। হঠাৎ মজুরদের মধ্যে একজন সত্যানন্দ দেবের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালো: তার স্ত্রী তার ঘর করতে না চেয়ে বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। ঠাকুরমশায়কে সে কোথায় আছে ব'লে দিতে হ'বে। সত্যানন্দ দেব সেই মজুরটির ভেতর কি দেখলেন তা' তিনিই জানেন, তবে মুখে বললেন, "তুই যদি সুমুখের ঐ টিনের চালার উপরে একপাশে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা ঠাকুরের নাম করতে পারিস, তা'হলে তখন দেখবো কি করা যায়।" মজুরটি ঘরিতে গিয়ে উঠলো সেই টিনের চালার উপরে আর একপাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম করবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রথমে 'রামকৃষ্ণ' নাম ভালোভাবে উচ্চারণ করতে না পারলেও,

কিছুক্ষণের মধ্যেই জোরে জোরে রামকৃষ্ণ-নাম করতে লাগল। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে মজুরটি তপ্ত টিনের চালার ওপর দাঁড়িয়ে 'রামকৃষ্ণ' নাম জপ করে চলেছে। জপে সে একেবারে বিভোর। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পর সত্যানন্দ দেব তাকে নামতে আদেশ দিলেন ও প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে কেমন লাগলো ?" "খুব ভালো ঠাকুর," ব'লে সে বারবার প্রণাম করতে লাগলো, "আমি আর কোথাও যাবো না, আমি এখানেই থাকবো, খাটবো আর ঠাকুরের নাম করবো " তার স্ত্রীপুত্রের জন্যে যে ব্যাকুলতা জন্মেছিল, তা' ঈশ্বরপ্রেমে রূপান্তরিত হলো। সে বাস্তবিকই ক্ষুদ্রগৃহের মোহত্যাগ ক'রে বৃহৎ গৃহের বাসিন্দা হ'য়ে গেল।

মজুরটির মোহভঙ্গকে পলায়ন করা বলা চলে না। আমরা ইট কাঠ পাথরের তৈরী বাড়ীকেই প্রকৃত গৃহ ব'লে মনে করি এবং এখানেই আমাদের ভুল হয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে যে সত্যানন্দ দেব যা ছেড়েছিলেন তা' গৃহ ব'লে কোন দিন তাঁর মনে হয়নি। তিনি যথার্থ গৃহের সন্ধানেই বেরিয়েছিলেন এবং ওই মজুরটিকেও তার সন্ধান পাইয়ে দিলেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শাশ্বত শান্তি ও পরমানন্দের সন্ধান করাকে কি পলায়ন ব'লে ? সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা লাভ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যিনি যথার্থ সত্যদ্রষ্টা তিনি জীবনটাকে অন্যভাবে দেখেন। ইংরেজিতে এইভাবটি একজন কবি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

Two men looked out from the prison bars.
One saw the mud, the other saw the stars.

কেউ কাদা দেখতে চায়, আবার কেউ আকাশের তারা দেখে আনন্দ পায়। সত্যানন্দ দেবের মতন ধন্যজন্মা বিরাট পুরুষেরা তাঁদের দৃষ্টি কাদার ওপর নিবদ্ধ না করে আকাশের তারার দিকেই চোখ ফেরান। তাঁরা যদি চাকরি করতেন, বিবাহ করে সন্তানপালন করতেন, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমাতেন বা দলাদলি, পরচর্চা পরনিন্দা ক'রে জীবন কাটাতেন তাহ'লেই কি খুব মহান কাজ করতেন ?

সত্যানন্দ দেবের আরো একটি মহৎ গুণ হোল, তিনি কারোর ব্যক্তিত্বকে বা স্বকীয়তাকে কখনও খর্ব করেন নি। তিনি শুধু অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে দিতেন মাত্র তিনি নিজেই বলেছেন : "আমি জমিটা তৈরী ক'রে দেবো, পারিপার্শ্বিকটা তৈরী ক'রে দেবো, তারপর তারা নিজের নিজের Originality নিয়ে ফুটবে।" তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে কারোর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছাদিত করতেন না। চেষ্টা করতেন অন্তরের মধ্যে যে সব গুণ আছে সেগুলি যেন ভালোভাবে ফুটে ওঠে। প্রকৃত সাধুব্যক্তি কখনই চান না যে একজনের আড়ালে শতসহস্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যাক। তিনি চিরদিনই impressive personality গড়ে তোলবার পক্ষপাতী ছিলেন ; ছিলেন স্বাধীনচেতা পুরুষসিংহ। তিনি বলতেন : "জীবনে কোথাও মাথা নোয়াবে না, নিজেকে নুইয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে। তালোর সঙ্গে একটা দৃঢ়তাও থাকতে হবে। তাঁর জীবনটাই ছিল সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের সঙ্গে দৃঢ়তার ও জয়যাত্রা। তাঁর দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে এবং অনেকেই সেগুলি জানেন ব'লে পুনরাবৃত্তি করলাম না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—তিনি অপরের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করতে চাননি বলেই নিজেকে "বাবা" ব'লে কোনদিন পরিচয় দেননি। "বাবা" শব্দের গুরুগম্ভীর ভাব তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি তো "বাবাগিরি" করতে আসেন নি, এসেছিলেন সকলকে তুলে ধরতে, সকলকে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ দিতে, সকলকে আনন্দ দিতে। তিনি যখন বহু সন্তানের গুরু হলেন তখনও কেউ তাঁকে "বাবা" বলে সম্বোধন করলে বিরক্ত হতেন। কাশীপুর বাড়ীতে ভোগের পর কিছু পোড়া আলু নিয়ে নিচে আসছেন—তখন নটু দেবু এরা খুব বাচ্চা, ওদের দিতে নামছেন—ঠাকুমা নটু দেবুকে বীরভূমের ভাষায় বললেন—"ঐ দেখ তোদের 'বেলুবাবা' আসছেন।" বীরভূমে জ্যাঠাদের পিছনে 'বাবা' শব্দ যোগ

ও'রে বলে, তাই সত্যানন্দদেব বলেছিলেন : "আমি কারও বাবা নই।" ছেলেদের শেখালেন, "আমাকে আনুদাদা বলবি!" তিনি যে শুধু বালকদের ভালোবাসতেন তাই নয়, বালকদের মতন থাকতেনও। তিনি বলতেন যে বালক ভাবে থাকলে কারও অন্তিম আকর্ষণ আমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে না। কেউ যখন সত্যি-সত্যি বালকভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তখন তার মধ্যে একটা উপেক্ষার ভাব এসে যায়। সহজ সরল ভাবেই তার মন, ও ব্যবহার বালকের মতন হয়ে যায়। এ বিষয়ে তিনি তাঁর গুরুর গুরু পরমগুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই অনুসরণ করেন।

আরো একটি বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন—সেটি হোল—জীবনের বৈচিত্রকে উপেক্ষা না করা। শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর কাছে প্রার্থনা করে বলতেন : "মা, আমায় শুঁটকে সাধু করিস না। আমায় রসে বশে রাখিস।" তিনি গান গাইতেন, গান শুনতেন, ভক্তিমূলক নাটক দেখতে ভালোবাসতেন। হাসি ঠাট্টাও করতেন। সত্যানন্দ দেবও মনে করতেন যে ধর্মবিষয়ে যদি মনকে ভালোভাবে ধরে রাখতে হয় তাহ'লে ধর্মপথেও এমন কিছু করতে হবে যাতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। তিনি নিজে খুব সুন্দর গান রচনা করতেন এবং গাইতেনও। আবার আশ্রমের মায়েদের দিয়ে সেই গান গাওয়াতেন। নাটকও অভিনীত হোত তাঁর নির্দেশে। ভক্ত শিল্প-শিল্পাদের উৎসাহ দিতেন গান ও নাটক শিখতে। আশ্রমের মেয়েদের থিয়েটার নামকরা থিয়েটারের চেয়ে কিছু কম ছিল না। তাঁর সাধনা ছিল পূর্ণাঙ্গ সাধনা : তাঁর ধর্মজীবন ছিল পূর্ণাঙ্গ ধর্মজীবন। এই পূর্ণাঙ্গ ধর্মজীবনের সূচনা তিনি করে গেছেন তাঁর প্রত্যেকটি শিষ্য-শিষ্যার জীবনে। তাঁরা সেই পথ ধরে পরমলক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনা করে চলেছেন।

সত্যানন্দ দেব পলায়ন করেছিলেন জীবন থেকে নয়—জীবনের গভীরতম প্রকোষ্ঠে, মানবজীবনের গূঢ়তম রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। তাঁর ধর্ম ও কর্ম ছিল মানুষকে নিয়েই কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঈশ্বর—দিব্যজীবন। তিনি অনুভব করেছিলেন ঈশ্বরের স্পর্শ, চিনতে পেরেছিলেন তাঁকে দেহীর দেহবাসী প্রিয়তম আত্মা ব'লে। তাই তাঁকে ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম জানিয়ে লিখেছিলেন :

ক্ষমা কর প্রভু গত দিনের ব্যথা
ক্ষমা করে নিও আগত সব কথা
চরণের তলে রেখো রেখো মোরে
হে করুণানিধান ;

তব স্তুত নামে যেন শান্তি আসে
তব নামে সব কল্যাণ ভাসে
তব কৃপা যেন দেয় প্রভু
সেই মঙ্গল ধাম।

"আমাদের ঠাকুরকে আমরা দেখেছি একেবারে সহজ অবস্থায়, একেবারে সহজ স্বাভাবিক শিশুর মতোই আমরা তাঁকে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিশুর মতো দু'হাত দিয়ে জগৎটাকে ছুঁই'। আমাদের ঠাকুরকে দেখে সেই কথাই মনে হয়—যেন শিশুর মতোই দু'হাত দিয়ে সমস্ত সাধনার জগৎটাকে ছুঁয়েছেন।"

—শ্রীঅর্চনা মা

দ্রোণ বধ ও যুধিষ্ঠির

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায়

ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণ মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র এবং মহাভারতের ঘটনার উপর তাঁহার প্রভাব প্রভূত। প্রথম বয়সেই তিনি ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করেন ও মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপর পরশুরামের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধনুর্বিদ্যা ও দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রাপ্ত হন। দারিদ্র্যের নিপীড়নে ও বাল্যবন্ধু দ্রুপদ রাজার অপমানজনক ব্যবহারে প্রতিশোধ গ্রহণাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি হস্তিনাপুরে আগমন করেন ও ভীষ্ম কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগের অস্ত্রশিক্ষার গুরুরূপে নিযুক্ত হন। রাজকুমারগণের মধ্যে অর্জুনই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন, এবং দ্রোণাচার্যের শিক্ষকতায় তিনি ধনুর্বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময় একলব্যের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণারূপে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার ক্রূর স্বভাবের পরিচয় দেন।

তাঁহার আদেশে গুরুদক্ষিণারূপে অর্জুন দ্রুপদরাজকে পরাজিত করেন সন্ধি স্থাপনান্তর দ্রুপদ মৌখিক সখ্যতা দেখাইলেও মনে মনে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন ও দ্রোণের বধের নিমিত্ত যজ্ঞ করত: যজ্ঞবেদী হইতে পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে বাল্যসখা দ্রুপদের নিকট হইতে অপমানজনিত রোষ দ্রোণের পরবর্তী জীবনকে চালিত করিল। তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে পিতৃতুল্য হইলেও এবং স্বাধ্যায়, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিলেও ক্রূরতা ও হিংসাপরায়ণতা তাঁহার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণের সন্ধি স্থাপনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য-কার্যও নিষ্ফল হইল। দুর্যোধন সকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিল এবং স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে সংযত করিতে অক্ষম হইলেন। দুর্ভাগ্যবশত: ভীষ্ম দুর্যোধনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন ; এবং দ্রোণ বলিলেন যে তিনি ভীষ্মের অন্নে প্রতি-পালিত, সুতরাং তিনিও সেই পক্ষেই যুদ্ধ করিবেন। অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন হেতু ভীষ্মের যে ধর্মচ্যুতি হইল, দ্রোণও সেই দোষে দোষী হইলেন। ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবগত ছিলেন. তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত তাঁহার প্রিয় পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। অবশ্য তাঁহার বাক্য ও আচরণ হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিলেন, কারণ তিনি ইহাও মনে করিলেন যে কৌরবেরা তাঁহার প্রতি বশংবদ ও তাঁহার শরণাগত। ভীষ্মের ন্যায় তিনিও ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনাদিকে এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ না করাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল কারণ, তাহাদের সহায়ক রূপে পাইয়া দুর্যোধনের দম্ভ ও যুদ্ধাভিলাষ বর্দ্ধিত হইল এবং নিজেকে অজেয় মনে করিল।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যখন উভয়পক্ষের সেনাবাহিনী সুসজ্জিত, তখন পাণ্ডবেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে নিরস্ত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির ক্রমঃ পর্যায়ে ভীষ্ম ও দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন ও তাঁহাদিগের বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও নিজ নিজ বধোপায় বলিলেন। দ্রোণ বলিলেন যে, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির মুখে কোনো অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগ করিবেন। কেবল তখনই পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষ্ম পতিত হইলে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি পদে বরণ করিল। ক্রূর দ্রোণাচার্য

দুর্যোধনকে বলিলেন যে, সে তাঁহার ইচ্ছামত একটি বর প্রার্থনা করিতে পারে। চতুর দুর্যোধন দ্রোণকে বলিল যে, তিনি যেন জীবিত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিয়া নিয়া আসেন। দ্রোণ মনে করিলেন যে, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রদ্ধা বা স্নেহবশতঃ দুর্যোধন তাঁহাকে বধ না করিয়া জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে অভিলাষী। কিন্তু দ্রোণের প্রশ্নের উত্তরে দুর্যোধন বলিল যে, যুধিষ্ঠিরকে বধ করিলে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবেরা অথবা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কৌরবদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে পারিলে তাঁহাকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত বনবাসে পাঠানো সম্ভব হইবে এবং সে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করিতে পারিবে। তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া দ্রোণ বলিলেন যে, অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে তাঁহাকে তিনি বন্দী করিবেন। তিনি দুর্যোধনকে উপদেশ দিলেন যে, কোনো উপায়ে অর্জুনকে যুধিষ্ঠির হইতে দূরে অন্যত্র যুদ্ধে নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

দ্রোণের এই আচরণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেনাপতি পদের কর্তব্য সমূহ যথাযথ রূপে দ্রোণের অবশ্য পালনীয়; কিন্তু দুর্যোধনের ক্রূর স্বভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সেক্ষেত্রে অযাচিতভাবে দুর্যোধনকে বরদানের ইচ্ছা প্রকাশ দ্রোণের পক্ষে প্রসন্নতার আতিশয্য প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ অর্জুনকে যুধিষ্ঠির হইতে দূরে ব্যাপৃত রাখার উপদেশও নিষ্প্রয়োজন ছিল। ইহার ফলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংশপ্তকগণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া অন্যত্র ব্যাপৃত রাখিল।

কিন্তু দ্রোণের যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার চেষ্টা সফল হইল না। তৃতীয় দিন প্রভাতে দুর্যোধন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল যে, তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতেছেন না। দ্রোণ বলিলেন যে, তিনি সেই দিন পাণ্ডব পক্ষের একজন শ্রেষ্ঠ বীরকে নিশ্চয়ই বধ করিবেন। তিনি অভেদ্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করিবেন, কিন্তু যে কোনো উপায়েই হোক অর্জুনকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। অর্জুনের ভারটি সংশপ্তক সেনারা গ্রহণ করিল, কিন্তু বালক অভিমন্যুকে অন্যায় পূর্বক বধ করিবার নিষ্ঠুর ভার দ্রোণ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্যতীত কেবল অভিমন্যুই জানিতেন। অর্জুন অভিমন্যুকে সেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার কৌশল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু নির্গত হইবার কৌশল শিখান নাই। অভিমন্যুকে অর্জুনের এবং অন্যের সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিয়া ব্যূহের মধ্যে একাকী তাঁহাকে ছয় জন দুর্ধর্ষ বীর সমবেত হইয়া সংহার করিবার যে ক্রূর পরিকল্পনা তাহার মূলে দ্রোণাচার্য। কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধতা হেতু দুর্যোধনের সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া ন্যায় অনুসারে যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেই দ্রোণ দুর্যোধনের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন, বা ধর্ম হইতে চ্যুত হইতেন না। দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত এরূপে অভিমন্যু বধের ন্যায় পাপ কর্মে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না। দ্রোণের অর্জুনের প্রতি যে স্নেহ ও বাৎসল্য ছিল সে সকলই তাঁহার এই কার্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ তপস্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভৃতিতে রত থাকিলেও যৌবনে ক্ষত্রিয়দের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তিনি যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করিলেন তখন হইতেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের হানি হইল, এবং দুর্যোধনের সেনাপতি রূপে তাহার কুফল প্রকাশ পাইল।

অর্জুনের অনুপস্থিতিতে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে অন্যান্য পাণ্ডব মহারথীরা অভিমন্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যূহে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যুকে রক্ষা করিতে পারিবেন। জয়দ্রথ ব্যূহের মুখ রক্ষা করিতেছিলেন, এবং শিবের বরে সেই দিনের জন্য অজেয় ছিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবেরা ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একাকী অভিমন্যু অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। অবশেষে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও বৃহদ্বল এই ছয় মহারথী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া একত্রে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণের পরামর্শে কর্ণ অভিমন্যুর ধনু ছেদন করিলেন, কৃতবর্মা তাঁহার অশ্বসমূহ বিনাশ করিলেন, ও কৃপাচার্য তাঁহার পার্শ্বরক্ষকদিগকে বধ করিলেন। অবশেষে দুঃশাসনের পুত্রের হস্তে অভিমন্যু নিহত হইলেন। দ্রোণ কলঙ্কিত হইলেন।

চতুর্থ দিবসে অর্জুন দ্রোণাচার্যকে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক অতিক্রম করিলেন ; এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে জয়দ্রথকে বধ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। দুর্যোধনের ও দ্রোণের জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ইহাতে নিরতিশয় বিচলিত ও নিরুৎসাহ হইয়া দুর্যোধন দ্রোণকে তিরস্কার করিয়া বলিল যে, তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন না। এই সময়ে দ্রোণ তাঁহাকে কিছু উচিত বাক্য বলিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের বাক্যে দুঃখিত হইয়া তিনি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন এবং রাত্রে যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া তৎক্ষণাৎ পাণ্ডব সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর প্রত্যূষে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন বলিয়া দুর্যোধন পুনরায় দ্রোণকে কটূক্তি করিল। তদুত্তরে দ্রোণ দুর্যোধনকে তিরস্কার করিলেন, এবং বলিলেন যে, তাহার জয়ের নিমিত্ত তিনি যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছেন। এখন যাহারা দিব্যাস্ত্র জানেনা তিনি তাহাদিগের উপরও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগরূপ হীন কার্য করিবেন যাহাতে দুর্যোধনের জয়লাভ নিশ্চিত হয়। দুর্যোধন শুভ অথবা অশুভ যাহা কিছু করিতে বলিবে তাহার প্রীতার্থে তিনি তাহাই করিবেন। দ্রোণের চরম পতন হইল।　　(ক্রমশঃ)

ওগো বন্ধু বলাকা

স্বামী অরূপানন্দ

হে বলাকা ! কোথা কোন দূরদেশ হতে
আস তুমি ঐ নীলিমায়
স্বচ্ছন্দ বিহার
কি নিস্তব্ধতায় মাখা—
তোমার গতির রূপ লেখা,
নীলাকাশ মাঝে যেন এঁকে যাও
কোন অচিন দেশের
শুভ্র পথ রেখা।

নাই কোনও কোলাহল
অশান্তের কোনও প্রতিচ্ছবি
সুন্দরের প্রশস্ত ললাটে
শিল্পীর তুলিতে আঁকা
সুষমার কাব্য মালা
গাঁথিয়াছে কোন এক কবি !

ঘনকৃষ্ণ মেঘ কোলে, ক্ষণিকের দেখা
আঁকে কোন ভাব অপরূপ
নিমেষে আলোর শিশু
ধরে কোন রূপ সায়রে
সম্বিৎহারা নিথর নিশ্চুপ।

হে মুক্ত বিহঙ্গ মোর—
কি আবেগে কার আকর্ষণে
ছুটে যাও উধাও উধাও হয়ে
শান্তি প্রশান্তি ভরা লোক হতে লোকে
নাহি বাধা নাহি বন্ধ নাহি কোন ছায়া
আঁধারের
অনন্ত আনন্দ গতি উর্ধ্বপানে চাহি
ভাক কিসে মাটির এ প্রাণে
বার বার ডানা প্রসারিয়া
তুমার আহ্বানে ?

ওগো বন্ধু বলাকা ! বলে যাও
ধরা দিয়ে একবার বাহুর বন্ধনে
এ নীলাঞ্জন ছায়ে
যুগান্তের কত ছবি আঁকা ঐ নীলবুকে
কত বর্ণ কত ভাব দিকে দিকে তার ?
আনিবে কি একটি বারতা চুপিসারে
মোর প্রাণে প্রাণে
কোথায় লুকাল চির-কিশোর আমার
কোন ফুলময় সুরময় দেশে
না
নিখিলের মরমীয়া গানে।

দুরন্ত শ্রাবণে

শ্রীশরণাপুরী

ওঙ্কু ওঙ্কু ধরেছিল ফুল বৃষ্টি
কদমের বুকে জেগেছিল নব তৃষা
জলে থলে ছিল একটি পরম নতি
মনে মনে ছিল চির অনন্ত দিশা।
নদীতে জাগিত কত অগনিত ভাষা
আকাশে কত না রঙের ঝরণা ছিল
যৌবনে ছিল কত মুকুলিত আশা
সবুজে সুনীলে ছিল গো কত না মিল।
সহসা বজ্র নিপতিত ধরাতলে
প্রলয় ডমরু বাজে ঘন গরজনে
ত্রাসে গঙ্গার জল ওঠে ফুলে ফুলে
শিহরায় শিখী হারাইয়া উপবনে।
সকল সৃষ্টি এক মুহূর্ত ক্ষণে
রসাতলে গেল দুরন্ত শ্রাবণে।

একেকদিন

শ্রীসুবেন্দু মল্লিক

একেকদিন হঠাৎ এসে দেখি নেই।
চলে যাওয়ার গন্ধে
ঢেকে গেছে আমার আবাহনের ঘার্থতা।
সিংহাসন জানেনা, জানেনা আমার
সারা জীবনের ফুলের অঞ্জলি
কোথায় লুকানো আছে দুটি কোমল পায়ের
নির্ভর;

যেমন মা জানেনা সহসা ভয়হীন শিশু
কেন ডানা মেলে উড়ে যায় অরক্ষিত নুড়ে
যেমন শিশু জানেনা সহসা সুগন্ধময়ী মা
কেন মিলিয়ে যায় পিছিয়ে চলা কুয়াশায়।
তাই একেকদিন শুধু চোখের জলের শব্দ
একেকদিন শুধু নেই নেই নেই।

★

শ্রীঅরবিন্দ

স্বামী সত্যাত্মানন্দ (বেলানগর

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে চরমপন্থীদের নেতৃত্ব করেন শ্রীঅরবিন্দ ও তিলক। মধ্যপন্থীদের কোন আপোস-রফাতেই শ্রীঅরবিন্দ রাজি হলেন না। পরিণামে সেখানে ঘটল এক দুর্ঘটনা,—ভেঙ্গে গেল সুরাট কংগ্রেস। ঐ ঘটনার পরে শ্রীঅরবিন্দের জনপ্রিয়তা অসম্ভব বেড়ে যায়, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে এক অবিসংবাদী নেতারূপে।

শ্রীঅরবিন্দ এবার গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এইজন্য তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীনকে বললেন, তাকে সাধনপথে সাহায্য করতে পারেন এমন একজন সমর্থ গুরুর সন্ধান করতে। বিখ্যাত যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলে তখন গোয়ালিয়রে অবস্থান করছিলেন। বরোদায় তাঁর এক শিষ্যের সঙ্গে বারীনের পরিচয় ছিল। ঐ শিষ্যের নিকট হতে ঠিকানা সংগ্রহ করে বারীন লেলেকে গোয়ালিয়র হতে বরোদায় আসবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করলেন। স্বতঃলব্ধ অনুভূতি শক্তিতে লেলে বুঝতে পারলেন, ভাবীকালের এক মহাপুরুষকে তাঁর দীক্ষা দিতে হবে বরোদায় তিনি বরোদায় চললেন।

এদিকে রাজনৈতিক কার্যোপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দও সুরাট হতে বরোদায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে চারিপাশের রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষান্তে গুরু শিষ্য সর্দার মজুমদারের বাড়ীর এক নির্জন কক্ষে তিনদিন আবদ্ধ রইলেন। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "লেলে যে ভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবে মনকে নিস্তব্ধ করে, চিন্তা মনে প্রবেশ করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখলাম আর যেমন

যেমন চিন্তা ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে আমিও তাদের ঠেলে বার করে দিতে থাকি। এইভাবে তিন দিনে সব চিন্তা দূর হয়ে গেল, মনে শাশ্বত নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। আমরা দুজনে এক সঙ্গে ধ্যানে বসে আছি—মনপ্রাণ-সমাহিত, —অন্তরে বাইরে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে,—ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য অনুভবে আসতে থাকে। মাথার উপরে ধ্যান করি—মাঝে মাঝে যেমন শক্তি নামতে থাকে, আমিও তাদের গ্রহণ করতে থাকি আর সেই সঙ্গে যে সব অনুভূতি জাগে, তাও গ্রহণ করতে থাকি, পরদিন প্রাতে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে তা' লিখে রাখি এইভাবে মন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, এমন কি সমগ্র চেতনাও স্তব্ধ হয়ে গেল আর অকস্মাৎ সেই নীরবতার মধ্যে আমার অব্যক্ত ব্রহ্মের উপলব্ধিও আসে। বোধহয় একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দ ব্যতিরেকে আর সবই অবাস্তব-মিথ্যা-মায়া। অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "লেলের নিকট হতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে তাঁকে নিবেদন করলাম,—এখন যখন আর একসঙ্গে থাকব না, তখন সাধনা সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন। তাঁকে একথাও জানাই যে আমার হৃদয়ে স্বতঃই একটি মন্ত্র উঠছে। লেলে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে মন্ত্রের কথা শুনলেন, তিনি তা' বন্ধ করে দিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যিনি হৃদয়ে মন্ত্র দিয়েছেন তাঁর উপর আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি কি না? উত্তরে জানাই, সব সময় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারি। তখন লেলে জানালেন, উপদেশের আর প্রয়োজন নাই।"

বরোদা হতে বোম্বাই, নাসিক, উমরাওতী, নাগপুর হয়ে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ফিরে আসেন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী লেলে কলকাতায়ও এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সকালে-বিকালে তিনি যথারীতি ধ্যান করেন কি না! শ্রীঅরবিন্দ বললেন—'না'।

তিনি লিখেছেন, "এখন আর আমি পুরাণমতে ধ্যান করি না; কারণ তখন মনের ভিতর অবিরাম সব সময়ই ধ্যান চলতে থাকে। সেজন্য আমি 'না' বলায় তাঁর ধারণা হয়, বোধহয় কোনও অশুভ বিরোধী-শক্তি আমাকে অধিকার করেছে এবং সেজন্য তিনি আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। আমি তাঁকে অবমাননা করি না, কিন্তু তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজও করি না। আমি এ সময় অন্তরদেশ থেকে নির্দেশ পাই যে, আমার মানুষ গুরুর প্রয়োজন নেই। এসময় সর্বক্ষণই আমার ভিতরে ধ্যান চলতে থাকে আর তখন থেকেই সব সময় আমি ভিতরকার নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করেছি। এইকালে আমি বন্দেমাতরমে যা লিখেছি তাও ঐ একই অবস্থার মধ্যেই লিখেছি।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে। মানিকতলা মুরারিপুকুর বাগান তল্লাসী হল। সেখানে বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহও তল্লাসী করা হয় তিনি লিখেছেন, "শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম। ভোর প্রায় পাঁচটার সময় আমার ভগ্নী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রেগান, চব্বিশ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীবিনোদ কুমার গুপ্তর লাবণ্যময় ও আনন্দায়ক মূর্তি, আরও কয়েকজন ইনস্পেকটার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা—হাতে পিস্তল লইয়া দৌড়াইয়া আসিল। শুনিলাম একটি পেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগ্নীর বুকের উপর পিস্তল ধরে—তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই।.....ক্রেগান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, অরবিন্দ ঘোষ কে? আমি বলিলাম, আমিই অরবিন্দ ঘোষ—অমনি একজন পুলিশকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন .....তারপরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল।.....প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়।.....এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা পাঁচটা হইতে আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারোটায় শেষ হয়।.....সাড়ে এগারোটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম—। ফটকের বাহিরে আমার মেসোমহাশয় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন।...পরে শুনিলাম আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া খানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন পুলিশ তাহাকে ফিরাইয়া দেয়।"

পুলিশ প্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে থানা, থানা হতে লালবাজার, লালবাজার হতে রয়েড ষ্ট্রীট গোয়েন্দা দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার লালবাজার হাজতে নিয়ে আসে। হঠাৎ এভাবে গ্রেপ্তার হওয়ায় তাঁর বিশ্বাস যেন একটু শিথিল হয়েছিল কিন্তু তিনদিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটাবার পর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস আবার ফিরে আসে তাঁর মনে। ভিতরের নির্দেশও তিনি শুনতে পেলেন,—তুমি কে? তোমার কি ক্ষমতা? দেশকে স্বাধীন করব আমি, তোমার জন্য অন্য কাজ আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। তুমি তাই করবে। তোমাকে আমিই এখানে এনেছি, আমার কাজের জন্য তৈরী করে তুলতে। আমিই তোমাকে রক্ষা করব।

প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া ভাষণে জেলের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—"আমাকে লালবাজার থেকে আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হল এবং এক মাসের জন্য মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে একটা নির্জন সেলে আবদ্ধ করে রাখা হল। সেখানে আমি দিবারাত্র অপেক্ষা করতে লাগলাম—আমার ভিতরের ভগবানের বাণী শোনবার জন্য, আমাকে কি করতে হবে তা বোঝবার জন্যে। এই নির্জন বাসেই এল আমার সর্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তখন আমার স্মরণ হল, আমার গ্রেপ্তার হবার একমাস বা আরও কিছু পূর্বে আমার প্রতি একটা আহ্বান এসেছিল সকল কর্ম ছেড়ে দিতে, নির্জন বাসে যেতে এবং নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করতে, যেন আমি ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্টতর ভাবে যোগযুক্ত হতে পারি। আমি ছিলাম দুর্বল, সে আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম হই নি। আমার কাজ ছিল আমার কাছে অতিশয় প্রিয়, আর আমার হৃদয়ের অহঙ্কারে আমি মনে করেছিলাম যে, আমি যদি সেখানে না থাকি তাহলে সে কাজের অনেক ক্ষতি হবে, এমন কি তা বিফল ও বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য আমি তা' ছাড়তে চাইনি। আমার মনে হল, তিনি আমাকে পুনরায় বললেন,—সে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি; কারণ, এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং কখনও আমার অভিপ্রায় ছিল না যে, তুমি এই কাজ নিয়ে থাকবে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরী করে তুলতে। তারপর আমার হাতে তিনি গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।...তিনি আমার রক্ষীদের মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারা জেলের কর্তা ইংরাজ অফিসারকে বললেন—উনি বন্দী অবস্থায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করে সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তাঁর সেলের বাইরে বেড়াতে দেওয়া হোক। সেই ব্যবস্থাই হল এবং যখন আমি বেড়াতাম তখন তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করত।"

উক্ত ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন,—"যে জেল আমাকে মানব জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে, সেইদিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম; কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব; দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছেন। আমার পালঙ্কস্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন, সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল।"

কারাগারের নির্জনবাসে ধ্যানস্থ অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ কিছুকাল স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হতেন শ্রীঅরবিন্দকে সাধন জগতের এক গুহ্য তত্ত্ব শিক্ষা দিতে।

পরবর্তীকালে নীরদবরণ রায়কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "কারাগারে বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে দিলেন অতি মানসের নির্দেশ, আর ঐত চেতনা কিভাবে সর্বত্র কাজ করে তার ইঙ্গিত।"

নীরদ—তিনি কি অতিমানসের কথা জানতেন ?

শ্রীঅরবিন্দ—'অতিমানস' আখ্যাটি আমার দেওয়া। এ শব্দ ব্যবহার বিবেকানন্দ করেন নি। তিনি বললেন —'ওটা এই, 'ঐটি এ রকম' এইভাবে। কারাগারে পনের দিন তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। আর, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি, ততক্ষণ শিক্ষা দিয়েছেন। শত চেষ্টায় ক্রিয়া সম্বন্ধে আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা করেছেন এবং আমি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পারা পর্যন্ত তিনি ছাড়েন নি।

নীরদ—গুরুরা কি এইভাবে এসে শিক্ষা দেন ?

শ্রীঅরবিন্দ—কেন দেন না ? প্রাচীনকাল থেকেই তো এ অভিজ্ঞতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক গুরুই দেহরক্ষার পর দীক্ষা দিয়েছেন।

নীরদ—আপনার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যে প্রভাবের কথা বলেছেন, সে কি এই ?

শ্রীঅরবিন্দ—না, বিলাত থেকে ফিরে যখন বরোদায় ছিলাম তখন তাঁদের বই পড়ি ; তার প্রভাবের কথাই উল্লেখ করেছি। সমগ্র ভারতেই তাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। হঠযোগ অভ্যাস করবার সময়ে আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল, তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন। পরবর্তীকালে এ ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। (১০-১ ১-৩৯)।

কারাগারের অনন্ত সাধনায় অলৌকিক শক্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

নিম্ন আদালতে শ্রীঅরবিন্দের বিচার সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "নিম্ন আদালতে যখন মোকদ্দমা ধরা হল, ম্যাজিস্ট্রেটের সুমুখে আমাদের আনা হল, তখনও আমার সঙ্গে গেল সেই নিগূঢ় দৃষ্টি। ভগবান আমাকে বললেন, যখন তোমাকে জেলে বন্ধ করা হয়, তোমার হৃদয় কি হতাশ হয়ে পড়েনি ? তুমি কি আমায় ডেকে বলনি, কোথায় আমার অভয় ছায়া ? এখন দেখ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে, সরকার পক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে। আমি দেখলাম, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম সেখানে বাসুদেবকে, দেখলাম বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন নারায়ণ। সরকার পক্ষে উকিলের দিকে তাকালাম, সেখানে আমি সরকারী উকিলকে দেখতে পেলাম না, সেখানে বসে আছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রিয়, আমার বন্ধু সেখানে বসে হাসছেন।"

পরে সেসন কোর্টের বিচার আরম্ভ হলে আবার প্রত্যাদেশ পেলেন শ্রীঅরবিন্দ—"তোমার পায়ে যে জাল জড়ান হয়েছে তা' থেকে এই মানুষটিই (ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ) তোমাকে উদ্ধার করবে। ঐ সব কাগজ ফেলে দাও, — তোমার পক্ষে তাকে উপদেশ দিতে হবে না, তাকে উপদেশ দেব আমি।...মনে রেখো আমিই এই সব করছি, তুমিও নয় আর অন্য কেউই নয়।"

যে আই. সি. এস. পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ও ল্যাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, সেই পরীক্ষাতেই ঐ দুই বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন মিঃ বীচক্রফ্‌ট। শ্রীঅরবিন্দের মামলার বিচারক হলেন তিনি। মামলার অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে শ্রীঅরবিন্দের ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণে বললেন, "এই বিসম্বাদ, এই আন্দোলন শুরু হবার দীর্ঘকাল পরে তাঁর। শ্রীঅরবিন্দের। তিরোধানেরও দীর্ঘকাল পরে পৃথিবীর মানব-সমাজ তাঁকে স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তার স্রষ্টা এবং মানব-প্রেমিক বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। তাঁর মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরেও তাঁর বাণীসমূহও কেবলমাত্র ভারতেই নয়, সাগরপারের সুদূর দেশদেশান্তর সমূহেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে।"

বিচারক বীচক্রফ্‌ট সি. আর. দাশের যুক্তি মেনে নিলেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে বিচারক রায় দিলেন।

(ক্রমশঃ)

রসো বৈ সঃ

আরতি

ধরার রঙ্গনাটে ভগবান-বিলাস করতেই তো নেমে আসেন। নিচে ভক্ত সেজে মাথা ঠুকে কেঁদে সাধনা করে, যুগে যুগে মানুষকে শিক্ষা দেন, 'আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে' –

আমাদের শ্রীঠাকুরের লীলাজীবনেও দেখি অখণ্ড নিবিকল্পে লীন থাকলে দেহ থাকবে না। তাই সাধক জীবনের শেষে ভক্তি ভক্ত নিয়ে মন নামিয়ে রাখতে, ভক্তির বিলাস রাজ্যে সাত্ত্বিক লীলায় মনকে আনন্দে রাখতে শ্রীঠাকুর সত্তানন্দদেবতেও দেখি তন্ত্র সাধী গোপালের পূজা করতে, গোপালকে আদরে ভরিয়ে দিতে। এমনি একটি প্রসন্ন মধুর দিনে শ্রীঠাকুর গোপালকে পূজা করলেন কিন্তু সেদিন গোপালকে আদর তেমন করে করা হয়নি। তাই গোপালের ছোট্ট বুকে জাগে অভিমান। অর্চনাদি মন্দিরে নিত্যপূজা সেরে প্রতিদিনের মত গোপালজীকে নানা উপচারে ভোগ দিলেন কিন্তু গোপালজীর মুখ ভারী—ভোগে নাই তৃপ্তি, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলেও না। শ্রীঠাকুর তখন সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে উপনিষদ পাঠের আসরে আছেন বসে। শ্রীঠাকুরের কাছে সংবাদ গেল—আদরে গোপালের ভোগ হচ্ছে না—শ্রীঠাকুর ঘর ফেলে উঠে এলেন—গোপাল সোনার বেলনা ভরা শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান—কিছুপরে জানতে পারেন গোপাল সোনাকে ভাল করে আদর করা হয়নি। তখন গোপালজীকে নিজের কোলটা ফোটা শ্রীহস্তে বসিয়ে মিষ্টি চুমায় ভরিয়ে তোলেন—তারপরই আশ্চর্যভাবে দেখা যায় তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ নিলেন। শ্রীঠাকুর এই বিলাস গাথা কবিতায় দিলেন রূপ। সুন্দর মিষ্টি কবিতাটি দিয়ে গোপালসোনাকে শোনালেন আবৃত্তি করে। সুন্দর কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবকটি এখানে তুলে দিই—

একটি মিষ্টি চুমা

অনেক বেলা হয়ে গেছে
সূর্যি মাথার পর।
ভোগ হতে যে হচ্ছনা ওগো
সয়না যে আর ভর।

মিষ্টি সে ত' অনেক আছে
দোকানেও যায় কেনা।
একটি মিষ্টি চুমা নিয়েই
মিটল পাওনা দেনা।

তোমার লীলার নীল কাজলে
চোখ ভরাতে রাজি।
রঙ্গনাথের রঙ্গনাটে
বসেই নিতি আছি।

শ্রীঠাকুরের গোপালজীর আদর উপচারের নেই শেষ, নিত্য নতুন খেলনা, খাবার, পোষাক, অলঙ্কার এসবের তো নাই অন্ত। গান-বাজনা-ভজন-আরতি কাব্য গাথা সে সব নিবেদনের ঘটাও খুব। শ্রীঠাকুরের আশ্রমের বাগানে দুপাশে দুটি ছোট্ট দীঘিতে লাল শাপলা লাগানো হয় শ্রীঠাকুরেরই সাধে। শ্রীঠাকুর রোজ সকালে ধ্যানান্তে আসন, প্রাণায়াম, আটক এসব করার পর, গোপালকে ওই দীঘির ধারে নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, লাল শাপলার বুকে গোপালজীকে বসিয়ে আদর করতেন, ছোট মেয়েদের দিয়ে ধুনোচী নৃত্য দেখানো এসব করাতেন। চাঁদের রাতে গোপালকে বাগানের মধ্যে ওই দীঘির ধারে নিয়ে এসে চাঁদের টিপ পরানো, আদর করে ছড়া বলে গান শোনানো এসব কত যে বিলাস করতেন—আর দেবতার দেবতার লীলা আমরা অবাক চোখে দেখতুম আর আনন্দ করতুম—শ্রীঠাকুর একদিন এই গোপাল দীঘি সম্বন্ধে একটা ছোট্ট কবিতা লিখলেন।

গোপাল দীঘি

ছোট্ট বল ছোট্ট না ত' গোপাল দীঘি এ।
কজ্জলিত ছোট্ট চোখে বিশ্ব বিছিয়ে

চঞ্চলিত চরণেই ত' নূপুর বাজিয়ে
এরই পাড়ে গোপাল সোনা যায়-যে নাচিয়ে।

শাপলা ফোটে রক্ত রাঙা জলটি রাঙিয়ে　　রাঙা দুটি চরণ রেখা পথেই বুলিতে
মুখটি ভাসে সেই জলেতে পাড়টি বাড়িয়ে　　বাসলে ভাল আপন করে দেয় যে জানিয়ে
গল্প শোনা কাবা কথা চায় সে শুনিতে　　আদর কাড়া ঠোঁটের কোণে ডালিম রাঙ্গিয়ে।

এমনি আরও একদিন সন্ধ্যায় গোপাল সোনাকে বুকে জড়িয়ে আদর করা হয়নি—সেদিন কিছু কাজের তাড়া ছিল। গোপালের অভিমান ভরারূপ দর্শনে শ্রীঠাকুর একটি সুন্দর কবিতা লেখেন ও আবৃত্তি করে শোনান। কবিতাটির নাম 'চলার সাথী'।

গোপালমণি একদিন কমল কচি হাত মেলে আইসক্রীম খেতে চান শ্রীঠাকুরের কাছে—এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীঠাকুর একটি কবিতা লেখেন। যেমন তার ভাষা তেমনি তার ভাব। আর তেমনি আদরে সুরে শ্রীঠাকুরের সেদিনের আবৃত্তি কোনদিন ভোলা যায় না—কবিতাটির শেষ স্তবক পড়লেই বোঝা যাবে

চাইতে ক্রীম থির থাকে না　　হাত পাতা নয় আহা মরি পাতল হাতের ছাঁদে
মাখাই সারা গায়　　অপটু এক প্রজাপতি শূন্য শুধুই সাধে
শীতল ভোগের এতই কি স্বাদ এতই মধু তায়।　　মিঠানি মন বড়ই নাকি মিঠাই বড় আজ
হঠাৎ পাওয়ার ক্ষুধ সে যে গো
বিদুরেরই লাজ।

নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের জলছবি এঁকে, কচি ঘাসের বুকে কাশের চামর দুলিয়ে, মাটির বুকে শিউলীর আলপনা দিয়ে, কাঁচা ধানের বরণ ডালা সাজিয়ে, দীঘির বুকে কুমুদ-কমলের পূজার্ঘ্য সাজিয়ে—পায়ে পায়ে শরৎ এসে দাড়ায়—উমা হৈমবতীর মহাপূজা যে সমাগত। ঘরে ঘরে হাসি-খুশী ছেলেমেয়েদের পূজার জামা তৈরীর পড়ে যায় সাড়া। শ্রীঠাকুরের আদুরে লালজীরও প্রতি বছর তৈরী হয় সুন্দর রঙবেরঙের ভেলভেট, ব্রোকেট, শিল্ক, ডে এণ্ড নাইট ইত্যাদি কত অসংখ্য রকমের কাপড়ের জামা—শ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসিনী মেয়েদের মধ্যে কথা হয় এবারে কেমন তৈরী হবে—শোভামা তো তৈরী করেনই হরেক রকম, সুমনাদিকে জনেক বলে খুব ভাল জামা চাই এবার—কিন্তু জামা তৈরীর শেষ রক্ষা হয় ঘুমের মাঝে। গোপাল সোনা নিজেই বলে দেন সুমনাদিকে ঘন সবুজ রঙের ভেলভেটের ওপর মুক্তার কারুকার্য করা জামা চাই—পরের দিনই সুমনাদি সবকিছু জোগাড় করে জামা তৈরী করে শ্রীঠাকুরকে দেখায়—এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীঠাকুর একটি কবিতা লেখেন 'পূজোর জামা' নাম দিয়ে। কবিতাটির শেষ কয়েক লাইন পড়লেই বোঝা যাবে শ্রীঠাকুর গোপালকে কত ভালবাসতেন :

কথায় শুধু ভেজে না যে শুকো চিড়ার বুক　　ঝকমকে মোর জামা হবে, সবুজ রঙেই কোরো
শেষ রক্ষা হয় শয়নেতে, ভুলায় সে সব দুখ।　　টুলটুলে সব মুক্তা এনে তারি সাথে ভোরো
ঘুমের মাঝে একি গো কার আদুর গুছি চুল,　　চাঁপার কলি দুটি আঙুল, দেখায় চেপে ধরে
জামা দিয়ে এলাই যেন দুধ আলতার 'বুল'।　　ঘুমের মাঝে মিলিয়ে গেল আলোপরী ভোরে।
এসেই বলে জামা হবে হবেও সব সারা　　ঘুমের শেষে সব কটি যে জোগাড় হয়েই যায়
এমনি কোরে তৈরী কোরো মুক্তা বোনা ধড়া।　　পূজার জামা হয়েই গেল লীলার কোথায় দায় ?

হিমঝরা শীতের সন্ধ্যা— শ্রীঠাকুর স্নানান্তে এসে গোপাল সোনাকে প্রতিদিনের মত আদর করতে গিয়ে দেখেন—গরম পোষাকে ঢাকা গোপালের সমস্ত দেহ কিন্তু হাত দুটি বেরিয়ে আছে সেজন্য হাত দুটি বরফের মত ঠাণ্ডা—শ্রীঠাকুরের মনে খুব আঘাত লাগে আর বলেন, 'এবার থেকে গোপালের উলের জামা যারা তৈরী করো তারা বিশেষ শীতের পরবার জন্য পুরো হাতা জামা করবে—যাতে গোপাল সোনার মুঠিও ঢাকা থাকে। আর চরণ পর্যন্ত ঢাকা থাকে যাতে মোজা পরার কাজও যেন তাতে হয়'— তারপর দুঃখিত মনে গোপালকে আবার যখন আদর করছেন তখন দেখেন দুঃখ ভুলিয়ে দেবার

ভক্ত গোপালের হাত দুটি গরম হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড শীতে পরার জন্য পোষাক কিন্তু সেইদিন থেকে শ্রীঠাকুরের নির্দেশ মত তৈরী সুরু হল আর এই অভাবনীয় ঘটনাকে নিয়ে শ্রীঠাকুর একটি কবিতা লেখেন।

দুনিয়টারে ওলট পালট করাই তোমার হরি

মুঠি ত' নয় এক মুঠো ছুঁই
মুঠেই আনন্দ।
সেদিন শীতের সন্ধ্যা বেলায়
লাগল কেন ধন্দ।
ছুঁয়েই দেখি যাদুর সে হাত
বরফ যেন হিম।
হয়ত তামায় দীক্ষা তাকেনি
করছে কিমবিম।
অপরাধের পাল্লা মোদের
মার্জনা নাই তার
মেয়েদের যে ঝুঁকি কত
বলাই হয় ভার

ভাবছি মনে এমন তর
যেন না আর হয়
দরদীরে জানতে গিয়ে
দরদ যেন রয়।
ফিরেই দেখি একি ব্যাপার
সোনার বরণ মুঠে
বসন্ত বন নিঙরে যে হাত
তপ্ত হয়েই ওঠে।
দুনিয়াটারে ওলট পালট
করাই তোমার হরি
আমরা বেশ বুঝি নিয়ে
'ওলাট' হয়েই মরি।

রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় গোপাল দীঘির ধারে রাসোৎসব হবে—আশ্রমের সব পূজার মূর্তিগুলিকেই নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু আমাদের রাধারাণীর পাশে তো গিরিধারী নাই তাই শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা কাশীপুরের 'ছাদবাগিচা'। শ্রীঠাকুরের পৈতৃক ভিটা। থেকে নিত্য পূজিত গিরিধারীকে রাসোৎসবে নিয়ে আসা—কাশীপুর বাড়ীতে জানানোও হয়েছিল কিন্তু ভালোমা গিরীধারীকে সাজাতে দেরী করে ফেলেন আর বয়েসও হয়ে গেছে – রাসোৎসবে যোগ দেবার মত সুন্দর করে সাজাতে পারছেন না কেবলই দেরী হচ্ছে কাঁদছেন আর বলছেন, 'তুমি নিজে নিজেই ভালোমত দেখে নাও, আমি তো অক্ষম হয়ে গেছি,—বলতে বলতে গিরিধারীর সাজসজ্জা—মনোরমভাবেই সম্পন্ন হয়—আশ্রমে আসেন ভুবনমোহন রূপে– শ্রীঠাকুর এই লীলা-চিত্র অবলম্বনে, একটি কবিতা লেখেন 'দুখের অধিরাজ' নাম দিয়ে– কবিতাটির শেষটুকু এখানে তুলে দিই—

চরণে আজ জানাই নতি শেষ নিওনা হায়,
আপনি যেন সেজেই নিও যেমন মন চায়।
অশ্রুতে হায় মিটেনা যে বুকের বেদনা,
হৃদয় স্বামী সবই জান নও তো অচেনা।
গোপীনাথের কথা আজ পড়ছে বড় মনে

দাঁড়িয়েছিলে পড়লে বসে পূজার সেই ক্ষণে।
বৃদ্ধ সেবক কুব্জ দেহ পায়না নাগালে,
তাইতো তারি কথা প্রভু শুনলে যে ছলে।
বুকের কথা দুখের কথা শুনলে তাই আজ
'মনমানা' সাজ সাজলে হরি দুঃখের অধিরাজ।

ফাগুয়া রঙ্গে রাঙা ফাগুনের ফুলবনে, রজলোকের চুম্বনে, বসন্তের আগমনে শ্রীঠাকুরের কবি লেখনী উন্মুখ হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি স্মরণে—লেখেন একটি সুন্দর ইংরাজী কবিতা। 'The Bluey Cresceut Moon' কবিতাটির নাম। কবিতাটির প্রথম ও শেষ দুটি স্তবক পড়লেই বোঝা যাবে কত সুন্দর কবিতাটি আর কত মিষ্টি তার পদ লালিত্য– শব্দ ব্যবহার কত আন্তরিকতাপূর্ণ।

The life azure and the life demure
All in blossom buret,
Sweet and low May breeze blow
East and west athirst.

The banian sighed, Him it spied
The bluey crescent moon.
Sweet Gadadhar in merry amour
Come Swiftly soon too soon.

দ্বারাবতীর ডাক

আরাধনাপুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সবার গোলমাল ঠেলে গেল আমাদের নাম গানে। সাগর বুকে ভাসতে ভাসতে চলেছে বোট, কাজেই ভয়েই সবাই চুপ। মাঝখানে মাঝিরা সমুদ্রের পূজা দিল ও সকলকে নারকেল প্রসাদ দিল। মাঝে মাঝে দ্বারকানাথের জয়ধ্বনি দিচ্ছে। আকুল জলধির বুকে দুলতে দুলতে বোট এসে ভিড়ল ভেটদ্বারকা। এখানে সাগরের বুকে নেমে গেছে আমরা এসে নামলাম। অনেকখানি পথ বেয়ে আমরা মাঝারি ধরনের প্রাসাদের মত রাজপুরীতে এসে ঢুকলাম। যেমন আগেকার প্রাসাদে থাকতো অসংখ্য গবাক্ষ দেওয়া প্রাসাদ। যদিও এটি কৃষ্ণচন্দ্রের আসল প্রাসাদ নয়। আসল রাজপুরী সমুদ্রবক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। দেউলের মধ্যে বড় বড় থাম। দেওয়ালে নানা বর্ণের ছবি আঁকা। সোনার সিংহাসনে দ্বারকানাথ রয়েছেন। পাশের দেউলে রয়েছেন রুক্মিণী। আর রয়েছেন সত্যভামা জাম্বুবতী ও অন্যান্য মহিষীরা। বাইরের মহলে রয়েছেন বৃন্দাবনের গোপীরা। ওপরে দ্বিতলে একটি ঘরে রয়েছেন সত্যভামা ভেলভেটের পোষাক অর্ধশায়িত অবস্থায়। আর রয়েছেন মীরাবাঈ গিরিধারী। সামনের ঘরে রয়েছেন লক্ষ্মী নারায়ণ যুগল রূপে। পাশে আর একটি মহলে সীতার বনবাসের রূপচিত্র বিগ্রহ করে সাজানো। আমরা পূজা দিলাম। যোগমায়া সোনার তুলসীপাতা ভেট দিল। শুনলাম এখানে পাণ্ডারা নিজেরা এক একজন মহিষী সেজে দ্বারকানাথকে আরতি করে। শুনে খুব মজা লাগল। এখানে পাণ্ডারা সাদা পাঞ্জাবী ও মাথায় পাগড়ী পরে। ছোট ছোট বালক পাণ্ডা তারাও সাদা ধুতি সাদা পাঞ্জাবী ও মাথায় পাগড়ী পরে রয়েছে। ভোগের ঘন্টা বাজল। আমরা নেমে এলাম। বাইরে হাটের সামনে জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। ভেটদ্বারকার স্মৃতিস্বরূপ কিছু জিনিস কিনে নিলাম। এবার ফেরার পালা। পথে এক দোকানী এসে ধরে তার দোকানে লুচি ও রাবড়ী খাবার জন্য। বলে, "আমার দোকানে সারদেশ্বরী আশ্রমের দুর্গাপুরী মা ও অন্য মায়েরাও খেয়ে গেছেন।" আমরা হেসে ফেলি। আমি, সুমনাদি, যোগমায়া, মন্টু ও সতীমা সেতুর ওপর দিয়ে এগোতে থাকি। কিছুদূর আসার পর দেখি সীতামা ও শম্ভুবাবু তখনও রয়ে গেছেন ভেটদ্বারকার দোকানে বাবার কিনবার জন্য। মন্টু বলে, "আপনারা বোটের কাছে যান, আমি ওদের ডেকে আনি।" দেখতে দেখতে মন্টুও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমরাও এগোতে এগোতে বোটে এসে উঠে বসলাম। মন্টুদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। এমন সময় বাঁশী বাজিয়ে বোট ছেড়ে দিল। আমরা ভাবতে লাগলাম। আমরা তিনজনে চলেছি, ছেলেরা রয়ে গেল ওপারে। সুমনাদি বলেন, "ভাবিস না ওরা ঠিক আমাদের দেখতে পাবে।" আর তীরে যারা ছিলেন তাঁদের বলে দিলেন ওদের যেন বলে দেয় আমরা এগিয়ে গেছি। শ্রীঠাকুরের কৃপায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোটের ভাড়াও দিয়ে দিলেন। বিশ্রাম করে বসে আছি মন্টুদের অপেক্ষায়। সঙ্গে জল নেই, তিনি লেমনেড কিনে দিলেন। ধীরে ধীরে বোট এসে ভিড়ল ওখা বন্দরে। পরের বোটে মন্টুরা এল। এখন ফেরার জন্য বাস নেই। শম্ভুবাবু বলেন, "চল রেল স্টেশনে যাই, যদি ট্রেন যায়।" এক মাইল হেঁটে স্টেশনে এলাম। স্টেশন মাষ্টার বলল, "রেল যাওয়া বন্ধ থাকবে এখন কয়েকদিন।" আবার ফিরে আসি বাসের গুমটিতে। সেখানেও বাস ছেড়ে দিয়েছে। মাত্র তিন চারিটি বাস যাওয়া আসা করছে। বেলা বারটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাস গুমটিতে বসে রইলাম। ছটার সময় একটী বাস এল। বাসে একশত জনের সিট আর যাত্রী রয়েছে দুইশত জন। পাণ্ডারা বিহারী গ্রাম্য লোকেদের ধরে এনেছে তীর্থ করাতে। সঙ্গে তাদের একটি করে টিন। টিন থেকে কি সব বার

করে যাচ্ছে আবার তিন বছর করে সিট করে বসে পড়েছে। এ এক অদ্ভুত আচরণ। যাক ঠাকুরকে অনেক ডাকার পর বাসে আমরা জায়গা পেলাম। রাত্রি নটার সময় আমরা মঠে ফিরে এলাম।

ওখা যাওয়ার উপলব্ধি আমাদের এমন হল যে, শুনলে আর হয়ত কেউ ওখা যেতে চাইবে না। স্নানাহার সেরে ওখার স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের আলো এসে ডেকে তোলে আমাদের—মন্দিরে যাবে না। সবাই তৈরী হয়ে পুজা নিয়ে যাই মন্দিরে। আবার কালাচাঁদের সঙ্গে দেখা। দেখি শৃঙ্গার হচ্ছে। জরীর কোট চোস্ত ও মাথায় পাগড়ী বাঁধা হল দ্বারকানাথের বিরাট আয়নায় প্রতিবিম্ব গিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে দ্বারকানাথ টেনে নেন কাছে পরিয়ে দি গলের মালা 'আমন তোমায় সাজিয়ে দেবো আজকে মোহনরূপে।' গান শেষে পাণ্ডাজী জিজ্ঞেস করেন হিন্দিতে, "আপনারা কি চলে যাবেন?" আমরা বলি, "কি করে যাব, রেল লাইন যে ভেঙ্গে গেছে।" পাণ্ডাজী বলেন, "দ্বারকানাথ আপনাদের যেতে দেবেন না, তাই আটকে রেখেছেন।" আমরা হেসে বলি, "হ্যাঁ, দ্বারকানাথের চরণে বন্দী।" শরণাদি দ্বারকানাথকে রূপার বাটি ভেট দিয়েছিল। পাণ্ডাজীকে দেওয়া হল। পাণ্ডাজী সেই বাটিতে করে মাখন মিছরী ভোগ দিলেন ও মন্টুকে ডেকে দেখালেন। এ বেলার মত পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ফিরে এলাম মঠে।

একদিকে চলে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা, মুখে চলে পরামর্শ বিকেলে সাগর বক্ষে সূর্যাস্ত দেখা ও গোমতীশ্বর ও চক্রনাথ দেখে মন্দিরে যাওয়া। ওদিকে মন্টু ও শম্ভুবাবুর চলে ঘন ঘন বাস অফিসে ও রেল স্টেশনে আনাগোনা। রেল ছাড়বে কিনা বাস ছাড়বে কিনা। ভেরাবলে বাস আসা যাওয়া করছে কিনা। বিরাট দুশ্চিন্তা, কিভাবে ভেরাবল যাওয়া হবে। বাস অফিসে বলেছে, একটি বাস গেছে এখনও ফেরেনি। দুপুর নাগাদ শোনা গেল বাস এসেছে, আবার যাচ্ছে। প্রফেসর শেঠ পরামর্শ দিলেন মন্টুকে চলুন সাধু বাসের সিট রিজার্ভ করে আসি আর ট্রেন যদি ছাড়ে তো ট্রেনেই যাব। যাক্ বাসের টিকিট কাটা হল। বাসেই যাওয়া স্থির। বিকেলের দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাগর পানে। প্রথমেই আমরা গোমতী সঙ্গমে গোমতীশ্বরের কাছে গেলাম, প্রণাম করে সাগর বেলায় নেমে এলাম। দেখি আকাশপারে চলেছে সূর্যাস্তের সমারোহ। দিনান্তের সমস্ত চঞ্চলতার পরিসমাপ্তি আর এপারে তিনটি নিস্তরঙ্গ মনে বেজে ওঠে বাউলীয়ার একতারা 'খেয়া পারাপার নাহি যার পারে নিয়ে যাবে কেগো হাতে ধরে ধরে।' ভক্ত ভগবানের দুটি মন এক হয়ে যায় ধ্যানের গভীরে। আধো আলো আধো অন্ধকারে ঠাকুরের গানের খেয়া ভাসিয়ে রেখে ফিরে আসি। গোমতীর মেসে। ফিরতি পথে দেখি সন্ধ্যাতারার লাজুক দুষ্টিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে গোমতীর বুকে। পায়ে পায়ে ফিরে আসি মন্দিরে। আজ শেষ বিদায়ের বেলা। প্রতিদিনের মত আজও আরতির শেষে গানের ডেট দিলাম, অর্চনাদির লেখা গান "এ মধুরাতকো হাম ভুল না যাও এ ফুল ডোরী হাম খুল না যাও। মৈ ন ভুলু তুহমে তুম ন ভুলো তুম চুপ রহ লে স্বপন মে।" গানের পালা হল শেষ। পাণ্ডাজী বলেন, "মাঈজী, আপনাদের জন্য দ্বারকানাথের মন খারাপ করবে, এমন করে কে গান শোনাবে।" নীলমণির নীল নয়নে রয়ে গেল আমাদের স্মৃতি। শেষ প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম মঠে। কাল যাত্রা হবে শুরু সোমনাথের চরণ তীর্থে। সুতরাং পরদিন আমাদের যাত্রা হল শুরু সোমনাথের চরণ-তীর্থে। ভোর ছটার বাসে আমরা রওনা হলাম ভেরাবল্। ভোরের মিষ্টি আলোয় আর পাখীর কাকলীতে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব সিম্ফনি। ছুটে চলেছে বাস। পথের ডানদিক ঘেঁষে যুগ যুগান্তের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর নিয়ে বয়ে চলেছে নীল সাগর। কৃষ্ণচন্দ্রের কত কাহিনী সে না জানে! মাঝে মাঝে পার হচ্ছি সৌরাষ্ট্রের নারকেল কুঞ্জের দীর্ঘ বাগান। মনে হল নারকেলের চাষ করা হয়েছে। বাসে অনাবশ্যক যাত্রীদের কোলাহল। ধ্বংস লীলার মাঝখান দিয়ে বাস চলেছে। মাঝে মাঝে পড়ছে জলোচ্ছাসে ঢাকা পুল। পুলের শুধু কালো খুঁটিগুলোর মাথাটা বেরিয়ে আছে আর ওপর দিয়ে সাগরের জল বয়ে যাচ্ছে, মিশছে গিয়ে বাঁদিকে গোমতী নদীতে। একপাশে সাগর আর একপাশে নদী। কোন কূল কিনারা নেই।

এতক্ষণ সকলে গোলমাল করছিল, সেই এই পুল পার হচ্ছে অমনি যাত্রীরা ভয়ে বলছে 'জয় দ্বারকানাথের জয়।' 'জয় সোমনাথের জয়।' কথা সাহিত্যিক প্রফেসর শেঠ উপহাস করে বলেন, "বেটারা এতক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিল, এবার মরণের ভয়ে ভগবানকে ডাকতে বসেছে।" আমাদেরও মনে হচ্ছে এ যেন মৃত্যুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলা। পথে পড়ল পোর বন্দর স্টেশন। গত দিনের সাইক্লোনে সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। ট্রেনের আনাগোনা বন্ধ। টেলিগ্রাফের পোস্ট, টেলিফোন পোস্ট মাইলের পর মাইল সমস্ত ধরাশায়ী অবস্থায় পড়ে আছে। কতদিনে যে মেরামত হবে তার ঠিক নেই। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ। ড্রাইভার বলে ওঠে হিন্দিতে, বাসের টায়ার বার্স্ট করেছে। কনডাকটর আমাদের সকলকে নামিয়ে দিল মাঠের মাঝখানে। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ। আমরা একটা ভাঙ্গা ছাউনীতে এসে দাঁড়ালাম। কয়েকজন বোম্বাইয়ের মহিলা আমাদের জানালেন, দিদি, দ্বারকাধীশের মন্দিরে আপনাদের গান শুনেছি। কি সুন্দর! সব কথাগুলি হিন্দিতে বললেন। বাসে যত যাত্রী সবাই এসে আমাদের ভজনকে ধন্যবাদ জানান। ত্রিনয়নী মার মূর্তি নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি প্রণাম করবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে আর একটি বাস পেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই বাসের লোকেরা মিলে আমাদের বাসটিকে মেরামত করল। একঘণ্টা পরে বাস ছাড়ল। পথের ক্লান্তি নিয়ে বাস চলেছে দূরের পানে। যাত্রীরা এখন চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে সোমনাথের জয় দিচ্ছে। কতক্ষণে পৌঁছান যায়। ক্ষুধায় পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়বার যোগাড়। রাস্তায় লোকানে খালি গাটিয়া ভাজা আর চানা, কাজেই মনটা তাদের ভরছে না, বিধি হইল বাম। হঠাৎ আবার ভীষণ শব্দ। আবার বাসের পা ভাঙ্গল। এখনও ষোল মাইল বাকী। সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কনডাকটর হিন্দিতে বলে, "সবাই ভগবানকে ডাকুন, আমি আস্তে আস্তে বাস নিয়ে যাচ্ছি।" আমরা তো ত্রিনয়নী মাকে ঠাকুরকে খুব ডাকছি। সন্ধ্যা সাতটার সময় বাস এসে পৌঁছাল ভেরাবলে। ভেরাবল শহরটা দেখতে কলকাতার মত, তবে মানুষের পোশাক ও ভাষা শুনলে বোঝা যায় এটা বিদেশ। আমরা একটি গুজরাটী ধর্মশালায় উঠলাম। বিরাট দ্বিতলে খালি আমরা ও আর একটি বাঙালী পরিবার। আর কোন যাত্রী এসে উপরে থাকলো না, কারণ ওপরে ভাড়া বেশী। নীচের ঘরগুলি যত নোংরা তত অপরিষ্কার। ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। ওপর থেকে দেখি নীচে যত গুজরাটীরা এসে থাকছে। এখানে এত মাছি যে, ছেলে মেয়েদের হাতের খাবার চেনাই যাচ্ছে না। অথচ এরই মাঝে বিরাট বপু নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে জীবাণুর সঙ্গে বেশীর ভাগ দেখলাম দলে দলে আসছে স্কাউটের ছেলেমেয়েরা। একসঙ্গে দুইশত থেকে তিনশত। সকালবেলা বেড়াতে যাচ্ছে আবার সন্ধ্যায় ফিরছে। সঙ্গে রয়েছেন শিক্ষক এবং তাঁরাই খাবার পরিবেশন করছেন খাবার খেয়ে তারা বিরাট হিমশীতল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই নিদ্রা যাচ্ছে আবার সকাল হলেই নিচ্ছে বিদায়। টাঙ্গাওয়ালাকে বলা ছিল। পরের দিন বেলা দশটার সময় আমরা রান্না করে রেখে প্রথমে গেলাম প্রভাস তীর্থে। যতই এগোচ্ছি আকাশ বাতাস বলে যাচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্রের ঘটনা বহুল দিনলিপি। আমরা সঙ্গমের তীরে বসে কিছুক্ষণ জপ করলাম। পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে এখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাট যজ্ঞ করেন। তাই আজও লোকেরা এখানে এলেই পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ জানায়। পাণ্ডারা আমাদের ঘিরে ধরল। মন্টু তাদের ভাগালো। সঙ্গমের জলস্পর্শ করে আমরা প্রভাসের চিহ্নস্বরূপ কিছু কমলা কড়ি ও তীর্থ বারি নিয়ে টাঙ্গায় করে এলাম দেহোৎসর্গ ঘাটে। এখানে কৃষ্ণলীলার অবসান। চারিদিকে একটা বিষাদের ছায়া। নীরবে বয়ে চলেছে সরস্বতী নদী। ঘাটের ওপর রয়েছে একটি কলিকা ফুলের গাছ নীরবে যে করে যাচ্ছে রোজই কৃষ্ণ-পূজা। আমি, সুমনাদি, সতীমা, সীতামা, যোগমায়া সকলে মিলে ফুল তুললাম সোমনাথজীকে পূজা করব বলে। ফুল তুলে আমি ও যোগমায়া নেমে গেলাম একতলা-সমান নীচু সিঁড়ি বেয়ে ঘাটে। পূজার পুষ্প ভাসিয়ে দিলাম শ্যাম-সুন্দরের উদ্দেশ্যে। সতীমা বকতে লাগলেন, তোদের আর কোথাও নিয়ে আসব না। বকুনি খেয়ে দুজনে উঠে আসি। সেখান থেকে হাঁটাপথে কিছুদূরে গেলাম শঙ্করাচার্যের নব নির্মিত সারদা মঠে। মঠ নির্মাণ শেষ হয়নি। মঠে মন্দিরে

রয়েছেন শঙ্করাচার্য একপাশে দ্বারকানাথজী আর রয়েছেন নৃসিংহদেব। আমরা শঙ্করাচার্যের লিখিত ভবানী স্তোত্র গান করলাম। গান শেষে প্রণাম করে মন্দিরের পিছনে ছোটখাটো একটি পাহাড় সেখানে গেলাম। সেখানে কতকগুলি গুহা রয়েছে। গাইডরা বলল এখানে পঞ্চপাণ্ডব লুকিয়ে ছিলেন। গুহা দেখলেই ভয় করে। একটি মানুষ কোন রকমে ঢুকতে পারে। বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম গুহার ভেতরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। একটি লোক খুব জিদ করতে লাগলো ভিতরে যাওয়ার জন্য। মন্টু বলে বাংলা ভাষায়, হ্যাঁ আমরা ভেতরে যাই আর তুমি আমাদের টাকা পয়সা ছিনতাই করবে। হবে এখান থেকে আমরা টাঙ্গায় করে এলাম সোমনাথজীকে দর্শন করতে। মাত্র দুইশত থেকে পঞ্চশত গজের মধ্যে দুটি সোমনাথের মন্দির। একটি অহল্যাবাঈ-এর প্রতিষ্ঠিত আর একটি ভারত সরকারের নির্মিত। আমরা প্রথমে অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে গেলাম পূজা দিতে। মন্দিরে যেতে পুরোহিত বললেন, সোমনাথজী নীচে পাতাল ঘরে। বার বার মুসলমানের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অহল্যাবাঈ মাটীর নীচে পাতাল ঘরে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমরা সকলে দেহমাপা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম ছোট্ট একটি ঘরে। ঘর জুড়ে ঘন গম্ভীর রূপ নিয়ে বসে আছেন সোমনাথজী। আমরা শিবের স্তব পাঠ করতে লাগলাম আর পুরোহিত পূজায় বসলেন। দুধ দই মধু দিয়ে স্নান করিয়ে চন্দন দিয়ে ওঁকার লিখে সোমনাথের পূজা আরম্ভ করলেন। পূজা শেষে পাথরের একটি থালায় করে ৫টি ডাল আর তরকারী ভোগ দিলেন। আরতি আরম্ভ করলেন। আমাকে ইসারা করে ঘন্টাধ্বনি করতে বললেন। সোমনাথজীর মাথার ওপর একপাশে ঘন্টা ঝুলছে। আমিও মনের আনন্দে ঘন্টাধ্বনি করতে লাগলাম আর সকলে মিলে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ গাইতে লাগলাম। সে এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। আজ সোমনাথজীর বন্দনা আরতি করল শুধু ঠাকুরের ছেলেমেয়েরা। আরতির শেষে আমরা সকলে সোমনাথজীর মাথায় দুধ গঙ্গাজল চড়ালাম। পূজা শেষে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলাম।

[ক্রমশঃ]

★

একতারা

শ্রীপ্রভাত কুমার চক্রবর্তী, এম. এ, বি. এল.

ওরে তুই বাজা, বাজা
দেহের একতারাটি
বাজা তুই বাজা, বাজা,
একই সুরে বাজা, বাজা।

দেহ নয় শুধুই মাটি
শুধু নয় খোঁকার টাটি
বাজালে বাজবে খাঁটি
(ও তোর) মাটির ঘরে আসবে রাজা।

দেহ নয় চৈতন্যময়
বাজিয়ে করিতে হয়—
সুরেতে সাধিতে হয়
এস গো প্রাণের রাজা।

শ্রীমন্দির

স্বামী স্বপানন্দ

আমি শবাসনে শুয়ে আছি নিশ্চুপ নিশ্চেষ্ট।
নিস্তরঙ্গ ভাগীরথী, স্তব্ধ সমীর, স্তব্ধ চারপাশ
এক মহাসমাধির শ্বেত শুভ্র সৌধ
তটিনীর শীতলতাকে আরও স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে।
আমি শবাসনে শুয়ে আছি,
বিদ্যুৎ ঝলকিত ক্ষিপ্র দুটি চরণের তীব্র জ্বলন্ত উত্তাপ
শিহরণ তুলবে না এ বুকে, জানি সে কথা···
আমি শুধু শুয়ে আছি একটি অনুভূতির কল্পনার
উন্মাদনায়
উন্মত্ত উদাসীনতায় তন্ময় হ'য়ে···
জ্বলে উঠেছিল এক যোগানল, পূত অগ্নির উদীপ্ত
অর্চিমালা,
লেলিহান শিখার শেষ আলিঙ্গন আপন বক্ষে টেনে
নিয়েছিল
সমাহিত শিবের নিস্পন্দ দেহ!
নিভে গেল আলো, রয়ে গেল ভস্মের স্তূপ,
ভস্ম নয়, শিবের আত্মদহনে সিক্ত-বিভূতি
এ সৌধ তারি স্মৃতি, জীবন্ত জ্বলন্ত স্মৃতি।
এক উত্তাল তরঙ্গ উদ্বেলিত করছে আমার অন্তর
বাইরে নিশ্চুপ রাত্রি, নিঝুম দিগন্ত,
শুধু এই মর্মর বেদীর চারিদিকের ঠাণ্ডা মাটী
হঠাৎ যেন শুকো কাঠের মত জ্বলে উঠতে চলেছে
এ মাটিতে কি আবার জ্বলবে এক টুকরো আগুন?
বিশ্বাসের তপস্যার পবিত্রতার আগুন?
জ্বলবে কি এক টুকরো প্রেমের আগুন?
সে অনল কি জ্বলবে আমার ভেতর বাহির চতুর্দিক
আলো করে?
আঃ! কি আনন্দ! অগ্নিময় আনন্দ!
অনন্ত জ্যোতি, অনাদি অনন্ত চৈতন্যের খেলা,
উদ্ভাসিত ঐ শিবময় সৌন্দর্যময় সত্তা
সত্য আনন্দ জ্যোতি ঐ রূপ নিল
স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো সে রূপ
স্বর্ণিম শ্রীমন্দির সোনার আঙিনা
সোনালি আকাশের চাঁদোয়ার নীচে সোনালি শূন্যে
চির অস্তিত্বময় একটি অভ্যুদয়
চির অচিন, চির আপন। আমি তার, সে আমার।
আমি চিরন্তন, তার সাথে এক, অদ্বয়, অভেদ।
আমি শুয়ে আছি শবাসনে
সে আমার পাশেই রয়েছে শুয়ে, দেখছি অনুভবে
এ সুখ শয্যা চির মিলনের চির স্নিগ্ধ চিরবাঞ্ছিত আনন্দের
চির সত্য জীবন্ত আলিঙ্গনের।
সুমধুর শান্তির সীমাহীন পারাবার
আজ উন্মুক্ত অন্তরে আমার।

অচিন কবিতা

স্বামী বীরানন্দ

একটা কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম
তোমাকে শোনাব বলে।
কাগজ কলম সব পেয়েছিলাম
মনটাকেও তো ডেকেছিলাম।
অনেক চেষ্টা করেছিল সে
একটা কবিতা লিখতে!
শুধু অনেক চেলেছিল
না-ছন্দ না-মিল
বেসুরে ভরা, অর্থহীন।
ব্যর্থ বেদনা-নীল মনটা
উঠেছিল শুধু গুমরে
না-পারার বোঝা বুকে নিয়ে।
হতাশ মনের বোবা কান্নাটা
অচিন ধরণীই কি শুনেছিল একা!

সেই তো বললো এসে
মধুর হেসে—
কিছু কি পার না
কর না চেষ্টা
লেখ দেখি কবিতা একটা।
প্রেরণা পাওয়া সদ্য জাগা মন
নতুন দিঠি মেলে দেখল বিশ্বভুবন—
আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে
অন্তরীক্ষে
সবার মাঝারে কবিতাই তো আছে লেখা
একটী নিটোল কবিতা।
সেই অচিন ধরণীই তো দেখি আদি কবি
বসে আছে নিয়ে সকল প্রাণের কবিতা খানি।

●

মা

শ্রীদুর্গাপদ সরকার

নূতনের বেশে চির পুরাতন
তুমি যে আমার মা॥
জনমে জনমে তোমারে চেয়েছি
সয়েছি অনেক যাতনা॥
নয়নের জলে ধোয়ায়ে চরণ
চেয়েছি তোমারি করুণা॥
নূতনের বেশে চির পুরাতন
তুমি যে আমার মা।

সাধক কমলাকান্তের ভজন স্থান দর্শন

শ্রীসতীশ চন্দ্র নাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পদপ্রান্তে প্রতিনিয়ত আকুল প্রার্থনা করতেন—মা তুই রামপ্রসাদকে কৃপা করেছিস্ কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কি কৃপা করবি না, আমি কি তোর দেখা পাবো না।...জগদম্বাও শ্রীরামকৃষ্ণের এ আকুল প্রার্থনা শুনেছিলেন। শরণাগতকে দর্শন দিয়েছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় উল্লিখিত দুজন মাতৃনাম সাধকের মধ্যে রামপ্রসাদের ভজন স্থানটি ভাগীরথীতীরে হালিসহরে। আর মাতৃভাবে তন্ময়ত্বজনকারী কমলাকান্তের ভজন স্থানটি হল বর্ধমান সহরের পশ্চিমপ্রান্তস্থ কাঞ্চন নগরের সন্নিকটে নিভৃতপল্লী। রামপ্রসাদের ভজন স্থানটি প্রাচীন কাঞ্চন পল্লীর (বর্তমান কাঁচরাপাড়া) সংলগ্ন, আর কমলাকান্তের ভজন স্থলটি কাঞ্চন নগরের নিকটস্থ। যাঁরা কাঞ্চন বর্জন করে অকিঞ্চন হয়ে করুণা প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের ভজন স্থান, পল্লী বা নগরের দূরেই থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কাল এখন থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে। আমরা তার পরবর্তী যুগকে স্মরণ করছি। সে যুগে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী জগন্মাতা সারদাদেবীর কৃপাধন্য তিন জন কঠোর নবীন সন্ন্যাসী, শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, শান্তানন্দ স্বামী, আর গিরিজানন্দ স্বামী ত্যাগ বৈরাগ্যে সকলের প্রণম্য। ঐ তরুণ ত্রিতাপদগ্ধ পদব্রজে শ্রীধাম জয়রাম বাটি থেকে বারানসী ধাম দর্শনে গমন করেছিলেন ১৯০৭ সনে। পরবর্তীকালে স্বামী গিরিজানন্দজীর পদতলে উপবেশন করে তাঁদের পদব্রজে কৃচ্ছ্রসাধনে ঐ তীর্থভ্রমণ কাহিনীর সামান্য বিবরণ শুনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তাও প্রায় অর্ধশতবর্ষ আগে। ঐ তীর্থভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে আমরা জানতে পারি বর্ধমানের উচালন গ্রামের অদূর কমলাকান্তের ভজন স্থানের বিবরণ। উচালন গ্রাম ধন্য হয়েছিল, সারদাদেবীর চরণস্পর্শে। সে কারণে সাধুত্রয় তাঁদের পরিব্রাজন কালে উচালন দর্শন করেছিলেন। আর বর্ধমান সহরের উত্তরস্থ ভেংগপুর কেশবগঞ্জ চটীতে অবস্থান করেছিলেন। এই কেশবগঞ্জ থেকেই কমলাকান্তের ভজন স্থানে যাওয়ার পথ। সে কালের জঙ্গলময় পথই এখনে মঙ্গলময় হয়েছে।

বর্ধমান রাজবংশের প্রসিদ্ধ মহারাজ মহাতপ চাঁদের স্বধর্ম নিষ্ঠার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় কেশবগঞ্জ গ্রামে মহারাজাদের আমলের একশ আট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায়। সেই অষ্টোত্তর শত শিবমন্দির সমূহ দর্শনে এসে জানতে পারলাম, বর্ধমান সহরের পশ্চিম অঞ্চলে কাঞ্চননগরের কাছাকাছি বোর হাট পল্লীটাই মাতৃমন্ত্রের সাধক কমলাকান্তের সাধনভূমি পূর্বকালে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ সে বিজনপল্লী অধুনা বর্ধমান সহর বর্ধিত হয়ে সহরতলী হয়েছে।

কমলাকান্তের আরাধ্য ধ্যানের চিন্ময়ী এখন মৃন্ময়ী মূর্তি। এখন বিধিমতো নিত্য সেবা পূজা আছে। ভেংগপুর কেশবগঞ্জের শিবমন্দির সমষ্টি কালনায় ১০৮ শিবমন্দিরের মতো বৃত্ত কারে নয়। এখানে কিন্তু সারি সারি চতুষ্কোণাকারে মন্দিরগুলো সাজানো প্রতিদিনের পূজার ব্যবস্থা থাকলেও এখন দায়সারা কাজই হয়ে থাকে। মন্দির মণ্ডলীর বাইরে পথিক বা যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা এখনও আছে। সেই শিবসমূহের স্থান থেকে কালীমাতার স্থানের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। মহারাজদের আমলের গোলাপবাগ, অধুনা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ক্রম বর্ধমান অট্টালিকাদি দর্শনান্তে যখন একলা আমি কমলাকান্তের ভিটায় পৌঁছলাম, তখন বেলা দুপুর। প্রাচীন কালীমন্দিরের দক্ষিণে নতুন নাটমন্দিরে বসে এক ভক্ত আপন মনে ভজন গান করছেন দেবীপূজার ডালা নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে পূজা নিবেদন করতে যে সকল নারীবৃন্দ সমবেত হয়েছেন, আপন মনে গায়কের সে দিকে নজর নেই। মিষ্ট সুরে তিনি গেয়ে চলেছেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মারে।
মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর কেউ যেন নাহি দেখে॥
কমলাকান্তের মন তাই আমার এই নিবেদন।
দরিদ্রে পাইলে রতন সে কি অনাদরে রাখে॥

এই গানের সুরে সমবেত পূজোপচার হাতে মহিলাবৃন্দের গুঞ্জরণও স্তব্ধীভূত। গান থামলো, আর ভীড়ের কোলাহল বাড়তে থাকলো। সকাল থেকে কষ্ট করে দর্শনে আসা সার্থক হল। ক্রমে ভীড় যখন কমে গেল, আমি পূজারী ঠাকুরের কাছে অনুসন্ধানে জানলাম মাতৃভক্ত কমলাকান্তের জন্ম ১৭৭০ ইংরেজী সনে। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য, আর মায়ের নাম মহাদেবী। তাঁদের আদিবাস ছিল অম্বিকা কালনায়। পরবর্তীকালে বর্ধমানের বর্তমান কাঞ্চন নগরের কাছে বসবাস করে এই বোরহাটের বটগাছের তলায় বসে মায়ের নাম করতেন আর গান করতেন। সাধক কমলাকান্তকে অজস্র প্রণাম।

রামানুজ কথা

শ্রীরাধাবল্লভ দে

যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীরামানুজের জীবনীতে যে দুইটি কাহিনী আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমার বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য।

একসময় শ্রীরামানুজ স্বামী ত্রিচকোটির পরম ভাগবত গোষ্টিপূর্ণের কাছে মন্ত্রার্থ গ্রহণে পরম ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আঠার বার প্রত্যাখাত হইবার পর গোষ্টিপূর্ণের এক প্রিয় শিষ্যের মাধ্যমে সকল মনোরথ হইলেন, কিন্তু এই সর্তে যে, শ্রীরামানুজ শুধু দণ্ডকমণ্ডলু নিয়া একাকী তাঁহার নিকটে আসিবেন। শ্রীরামানুজ কিন্তু দণ্ডকমণ্ডলু স্বরূপ দুই প্রিয় সহচর দাশরথি ও কুরেশকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্যদ্বয়ের প্রতি রামানুজের অদ্ভুদ একাত্মবোধ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া গোষ্টিপূর্ণ স্বামী তাঁহাকে অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রের অর্থ জ্ঞাপন করিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত এই পবিত্র ও নিগূঢ় মহামন্ত্র যেন তাহাকেও বিতরণ না করা হয়। কথিত আছে দিব্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীরামানুজ সেইদিনই বিষ্ণুমন্দিরে লোকজড় করিয়া এই মন্ত্রার্থ তাহাদের নিকট ব্যক্ত করেন। মহাত্মা গোষ্টিপূর্ণ স্বামী এ সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং শ্রীরামানুজ তাঁহার নিকট উপনীত হইলে ভৎর্সনা করিয়া বলেন, "মহামন্ত্রের অসদ্ব্যবহারে তিনি মহাপাতকী হইয়াছেন এবং নরকই তাঁহার উপযুক্ত স্থান। রামানুজ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন—"তাঁর অনন্ত নরক-বাসের বদলে সহস্র লোকের ভাগ্যে যদি মুক্তি লাভ ঘটে তবে সেই অনন্ত নরকও তিনি কাম্য মনে করেন।" উত্তর শুনিয়া গোষ্টিপূর্ণ বিগলিত হইলেন। লোক মঙ্গলের জন্য যে মানুষ এমন করিয়া আত্ম বিলুপ্তি ঘটাইতে চায়, নিজের মুক্তি সম্পর্কে অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করে– পৃথিবীতে তাহার তুলনা কোথায়?

প্রেমভরে রামানুজকে আলিঙ্গন করিয়া প্রবীণ বৈষ্ণব গোষ্টিপূর্ণ স্বামী কহিলেন—"রামানুজ, তুমি ধন্য—ধন্য তোমার মানব প্রেম। শিষ্য হয়েও আজ তুমি আমায় তত্ত্বজ্ঞান শিখালে।"

আর একদিনের চিত্তাকর্ষক কাহিনী :—সদলবলে একদিন শ্রীরামানুজ তাঁহার এক দরিদ্র শিষ্য বরদাচার্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। জীর্ণ খলিটি লইয়া বরদাচার্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। শিষ্যগণসহ গুরুদেবকে দেখিয়া বরদাচার্যের সাধ্বী পত্নী লক্ষ্মীদেবী ঠাকুরঘরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল প্রতিবেশী এক শ্রেষ্ঠীর কথা। এই ধনাঢ্য বণিক কুপ্রস্তাব করিয়া কতবার তাঁহার নিকট দূতী পাঠাইয়াছে। ঘৃণাভরে তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এখন তিনি স্থির করিলেন, পরমারাধ্য পরম ইষ্ট গুরুদেবের সেবার জন্য তিনি দেহাত্মবুদ্ধি রাখিবেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন—শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহার কাছে গ্রহণ করিয়া রজনীযোগে নিজেকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। এইভাবে তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন এবং গুরুদেব ও তদীয় ভক্তবৃন্দকে সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। বরদাচার্য গৃহে ফিরিয়া আসিলে তিনি স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। পত্নীর মুখে সব শুনিয়া মহাভক্ত বরদাচার্যের আনন্দের সীমা রহিল না।

রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবী শ্রেষ্ঠীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। স্বামী বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়মতি শ্রেষ্ঠীকে লক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজ উপভুক্ত প্রসাদান্নের আস্বাদ গ্রহণ করাইবামাত্র তাহার পাপ প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। লক্ষ্মীদেবীর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল "মা তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি অশিব প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এতদিন নরপশুতে পরিণত হয়েছিলাম। গুরুদেবের সেবার জন্য যে অতুল আত্মত্যাগ তুমি আজ দেখিয়েছ তা আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে।"

প্রসাদান্নের অলৌকিক শক্তিতে নরপশু বণিকের রূপান্তর হইল। অনুতাপদগ্ধ এই বণিক ভগবান রামানুজের শরণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুশক্তি ও গুরুকৃপা অনন্যা ভক্তিপরায়ণা সাধ্বী শিষ্যারও মর্যাদা রক্ষা করিল।

প্রাচীন ভারতে রসায়নী চিন্তা

শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য

প্রাচীন ভারতে শুধু যে দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিকাশ হয়েছিল তা নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এর মধ্যে জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ চিকিৎসা বিদ্যাকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতে রসায়নের উদ্ভব হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাচীন যুগে এই ভাবেই রসায়ন বিদ্যার জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। সে যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রসায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

প্রাচীন ভারতে রসায়নের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির সাহায্য অপরিহার্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাবশতঃ প্রাচীন ভারতে রসায়নী বিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাননি। তাঁদের ধারণা রসায়নী বিদ্যার ক্ষেত্রে ভারত গ্রীক ও আরবদের কাছে ঋণী। এই ভ্রান্ত ধারণার প্রবল প্রতিবাদ করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর রচিত "এ হিষ্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি" নামক অমূল্য গবেষণা-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রয়েছে প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে তার বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত মুদ্রিত ও হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপুস্তকাদি গবেষণা করে আচার্য রায় এই অমূল্য গ্রন্থখানা রচনা করেন

বেদ আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ. ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল সূত্র প্রধানতঃ ঋক্ এবং অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। এতে বিভিন্ন লতাগুল্মের রোগ আরোগ্য শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের চিকিৎসা নৈপুণ্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় বৈদিক যুগে অন্ধকে দৃষ্টিদান এবং কৃত্রিম অঙ্গসংস্থান দ্বারা খঞ্জকে চলৎ-শক্তি দান প্রভৃতি চিকিৎসা বিদ্যার কঠিন বিষয়গুলি প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকগণের অজানা ছিল না। অথর্ব বেদে বৃক্ষলতাপাতার গুণাগুণ ও মানবদেহে উহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত আভাষ ইঙ্গিত আছে। অথর্ব বেদে মন্ত্রতন্ত্র, যাদু প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রাচুর্য থাকলেও আচার্য রায়ের মতে অথর্ব বেদই হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা আয়ুর্বেদের জনক এবং অথর্ববেদের চর্চাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় আলকিমির (Alchemy) জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্ব-প্রধান বৈশিষ্ট্য ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) তত্ত্বের মূলও অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। তবে বেদ চিকিৎসা গ্রন্থ নয়; পরবর্তী যুগে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্বেদের উদ্ভব হয়। আয়ুর্বেদ বেদের উপাঙ্গ বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

বেদের পরবর্তী যুগ হল আয়ুর্বেদের যুগ। এই যুগে প্রণালীবদ্ধভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে থাকে। এই যুগের বিস্তৃতিকাল খৃষ্ট-পূর্ব যুগ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগে হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থের গঠন, ধর্ম, অণু-পরমাণু প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির বিকাশ সাধন করেছিলেন। এই যুগে রসায়নী বিদ্যার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতসংহিতা নামক দু'খানা চিকিৎসা গ্রন্থে। এতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যুক্তিপূর্ণভাবে রোগনির্ণয়, রোগের গতি, প্রকৃতি ও চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থ দু'খানির মধ্যে চরকসংহিতা প্রাচীনতর। কিন্তু এটাই প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ নয়। এর আগেও বিভিন্ন আয়ুর্বেদাচার্যগণের রচিত চিকিৎসাগ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল। এমন ধরনের ছয়জন আয়ুর্বেদাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন চরক। এঁরা হচ্ছেন ভেল, অগ্নিবেশ, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারিৎ ও ক্ষারপাণি। দুঃখের বিষয় এঁদের রচিত গ্রন্থগুলি আজ অবলুপ্ত; পরবর্তী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে এঁদের উল্লেখ ও কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। উপরোক্ত ছয়জনের মধ্যে অগ্নিবেশকে অনুসরণ করে চরক তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

চরকসংহিতায় রোগ আরোগ্যে-বনৌষধির বহুল ব্যবহার দেখা গেলেও ধাতু ও ধাতুঘটিত খনিজের ব্যবহারের কথাও উল্লিখিত হয়েছে, যেমন লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ, সীসক, গন্ধক, তুঁতে, সোহাগা বিষ প্রভৃতি। এতে তৎকালীন হিন্দু চিকিৎসকগণের রসায়নী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চরকের কাল নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। নানা সাক্ষ্য প্রমাণের বলে চরককে বুদ্ধ-পূর্ব যুগের লোক বলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সিদ্ধান্ত করেছেন।

সুশ্রুত সংহিতা চরকের অনেক পরে রচিত। বৌদ্ধযুগের রসায়নাচার্য নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আদি সুশ্রুতসংহিতার সম্পূর্ণ সংস্কার করে যে নূতন রূপ দান করেন উহাই বর্তমানে প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতা। সুশ্রুতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি চরক অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় এবং ভাষাও অনেকটা আধুনিক।

সুশ্রুত প্রাচীন যুগের শল্যবিদ্যা (সার্জারি)র সর্বোত্তম গ্রন্থ আর চরক ঔষধবিজ্ঞানের (মেডিসিন) গ্রন্থ। সুশ্রুত সংহিতায় বহুপ্রকার শল্যচিকিৎসার যন্ত্রাদির বিবরণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগের বিবরণ আছে। এ ছাড়া সুশ্রুতে উন্নতধরনের রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার ক্ষার প্রস্তুত ও ব্যবহার বিধি, রক্তের বর্ণনা, ঔষধার্থে ধাতু ও ধাতব লবণের ব্যবহার প্রণালী সুশ্রুতে বর্ণিত আছে।

চরক ও সুশ্রুতের পর এ যুগের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসাগ্রন্থ বাগ্‌ভট রচিত "অষ্টাঙ্গ হৃদয়"। ইহা একখানি অমূল্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গ হৃদয়কে চরক ও সুশ্রুতের সংক্ষিপ্তসার বলা যায়। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্য ভেল ও হারিতের গ্রন্থের কতকাংশের উদ্ধৃতি আছে ও কিছু নূতন তত্ত্বের সংযোজন আছে। শল্যবিদ্যা বিষয়ে বাগ্‌ভটের স্বকীয়তার পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাগ্‌ভট অষ্টম শতাব্দীর লোক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাগ্‌ভটের পরে হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞান নূতন দিকে মোড় নেয়। একে বলা হয় পরিবর্তনের যুগ বা ক্রান্তি যুগ। এই যুগে চিকিৎসায় ধাতু ও ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন প্রাচীন রাসায়নিকগণ মূল আকর থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই যুগে প্রাচীন হিন্দুগণের রসায়ন ও ধাতু-বিজ্ঞানের পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ছিলেন বৃন্দ (৯০০খ্রীঃ) এবং চক্রপাণি দত্ত (১০৬০ খ্রীঃ)। এঁরা উভয়েই নাগার্জুনকে পূর্বসূরী বলে স্বীকার করে চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনা করেন।

বৃন্দের রসায়নী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ধাতুঘটিত ঔষধের বহুল ব্যবহারের মধ্যে। তিনি তাম্র, গন্ধক, লৌহ ও পারদ প্রভৃতি ঔষধার্থে ব্যবহার করেছেন। চক্রপাণি পারদসংক্রান্ত ঔষধ প্রস্তুতের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করেন। তিনি পারদ ও গন্ধক সহযোগে কজ্জলী (ব্ল্যাক্ সালফাইড অব্ মার্কারি) প্রস্তুতের প্রণালী দিয়েছেন। এ ছাড়া চক্রপাণি তাম্রযোগ, লৌহমারণ পদ্ধতি, ক্ষার প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ও ধৌপাঘটিত ঔষধাদির প্রস্তুত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এরপর আরম্ভ হয় তান্ত্রিক যুগ। এ যুগের বিস্তৃতি ১০০০ খ্রীঃ থেকে ১৩০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। এ যুগে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে রসায়নী বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ দু খানা তন্ত্রগ্রন্থে এ যুগের রসায়ন বিজ্ঞানে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ দুখানি হচ্ছে রসার্ণব ও রসরত্নাকর। অন্যান্য তন্ত্রের মত শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের ভেতর দিয়ে রসায়নী জ্ঞান প্রচারিত হয়েছে রসার্ণব তন্ত্রে। এতে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের বিশদ বর্ণনা আছে। যেমন—পাতন যন্ত্র, অধঃপাতন যন্ত্র, স্বেদনী যন্ত্র, ঘোলা যন্ত্র, নালিকা যন্ত্র, বালুকা যন্ত্র, তীর্যক পাতনযন্ত্র প্রভৃতি। রসার্ণবে আরো পাওয়া যায় আকরিক অবস্থা থেকে তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুনিষ্কাশন পদ্ধতি এবং স্বর্ণ ও পারদ শোধন ও মারণ প্রণালী। আচার্য রায়ের মতে এই যুগের হিন্দু রাসায়নিকগণ রসায়ন ও ধাতু-বিজ্ঞানে (মেটালার্জি) সমকালীন ইউরোপীয় রাসায়নিকগণ থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন।

তান্ত্রিক যুগের পরে আরম্ভ হয় ভেষজবিজ্ঞানের যুগ (১০০০খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ)। এই যুগে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান অতি উন্নত স্তরে উঠেছিল। এই যুগের রসায়নী বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ রসরত্নসমুচ্চয় ও রসেন্দ্রচিন্তামণি নামক দু'খানা গ্রন্থে। এই গ্রন্থ দু'খানিও পূর্বযুগের রসার্ণব গ্রন্থের ধাঁচে রচিত। রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে পারদ ও বিভিন্ন ধাতু ও খনিজ পদার্থ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে। সব চেয়ে বেশী গবেষণা হয়েছে পারদের ওপর। এই জন্য মাধবাচার্য প্রণীত সর্বদর্শন সংগ্রহ পুস্তকে পারদের ওপর গবেষণা 'রসেশ্বর দর্শন' নামে স্থান লাভ করেছে।

পারদ নিয়ে অত্যধিক গবেষণার ভেতর ভারতীয় আলকিমির আভাষ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের আলকিমিস্টগণ চিরযৌবন তথা অমরত্ব লাভের এবং পরশপাথর আবিষ্কারের, অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার চেষ্টার দীর্ঘকাল নানাধরনের গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। এমন ধরনের প্রচেষ্টা প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিকগণের মধ্যেও দেখা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন পারদ মানুষকে জরাহীন ও অমর করতে সমর্থ এবং পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। জরাহীন সুদীর্ঘ জীবন যাঁরা লাভ করতেন তাঁদের বলা হত 'রসসিদ্ধ'। রসরত্নসমুচ্চয়ে পারদকে বলা হয়েছে 'রসসিদ্ধি-প্রদায়ক'। রসসিদ্ধি বলতে বুঝায় (১) পারদের সাহায্যে সুদীর্ঘ জীবন লাভ এবং (২) পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত (transmutation) করা। উইলসনের অভিধানে রসসিদ্ধির এই অর্থ পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যায় যে হিন্দু রাসায়নিকগণের পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার কল্পনা নিতান্ত আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আধুনিক পরমাণু গবেষণার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে পরমাণু কেন্দ্রিনের সংস্থান পরিবর্তিত করতে পারলে এক ধাতুকে অপর ধাতুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞানীরা পারদ ও প্ল্যাটিনামকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন। (পপুলার সায়েন্স, মার্চ, ১৯৪৮) স্বর্ণের পরমাণুর ক্রমাংক (atomic number) ৭৯ এবং পারদের ৮০ ; যন্ত্রের সাহায্যে পারদের পরমাণু কেন্দ্রের একটি প্রোটন সরিয়ে দিতে পারলে পারদের পরমাণু স্বর্ণের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই পারদ থেকে স্বর্ণ প্রস্তুত করা অসম্ভব কল্পনা নয়। প্রযুক্তি বিদ্যা তখনও অনেক পিছিয়ে ছিল বলে হিন্দু রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে রাসায়নিক যন্ত্র প্রস্তুত প্রণালী, ধাতুশোধন প্রণালী, বিভিন্ন রস, উপরস, রত্ন, বিভিন্ন ধাতু যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, টিন, সীসক, পিতল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থখানিতে একাধারে ভেষজ বিজ্ঞান, ঔষধ প্রস্তুত বিজ্ঞান ও ঔষধ প্রয়োগ বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই গ্রন্থখানার উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন,—"R.R.S. is a systematic and comprehensive treatise on materia medica, pharmacy and medicine. Its methodical and scientific arrangement of subject-matter would do credit to any modern work, and altogether it should be pronounced a production unique in its kind in Sanskrit literature. Its value is further enhanced from the fact that the materia medica portion is harmoniously blended with chemistry." (A History of Hindu Chemistry—Introduction.)

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় এর পর আরম্ভ হয় হিন্দু রসায়নের আধুনিক যুগ।

— • —

কর্মশিক্ষা শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র

প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের এই অচল অবস্থার পরিবর্তন সাধন উদ্দেশ্যে প: ব: মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ কর্মভিত্তিক পাঠক্রম প্রচলনের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে ১৯৭৪ সালে ভারতে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে কর্মভিত্তিক পাঠক্রম চালু হয় এবং ১৯৭৬ সালে নতুন পাঠক্রমের প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হয়। প্রায় সোয়া লক্ষ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। সামাজিক মূল্যবিশিষ্ট কর্মশিক্ষা ও মধ্যশিক্ষার সমন্বয়ে রচিত কর্মমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের দেশজোড়া এই প্রথম বিরাট পরীক্ষাপর্ব সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় বর্তমান বিতর্কিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যেষে দেশবাসীর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু এই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে দেশের সকল মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মশিক্ষা বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা করাও আশু প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব সবিশেষ উপলব্ধি করে পর্ষদ এই রাজ্যে ইতিমধ্যে দুটি পূর্ণাঙ্গ কর্মশিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। প্রথম কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার হরিণঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমে স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলার সিউড়ীস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের কার্যনির্বাহী অধিকারীক শ্রীসুনীল চন্দ্র রায়।

নব প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রে **Pre-processing of cotton and Spinning by New Model Charka, potteries, bee-ke pi g, soap-making, face cream & phenyle, chalk pencil makii g** ইত্যাদি কর্মপ্রকল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রয়োজনমত ইনস্ট্রাকটর ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে শিল্প-প্রকল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন ভারতের খাদি ও গ্রামীণ শিল্পসংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ খাদি গ্রামোদ্যোগ সংস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মহাশয়ও কর্মপ্রকল্প রূপায়ণে অশেষ সাহায্য করেন। বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা থেকে মোট ৩৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কেন্দ্রের প্রথম পর্বে যোগদান করেছেন।

কেন্দ্রটি চালু হবার পর গত ৬ই মার্চ '৭৬ পর্ষদ সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন চাটার্জি ও পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সংস্থার সভাপতি শ্রীনিহারেন্দু চৌধুরী মহাশয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে যান। ৩০শে মার্চ '৭৬ রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সারাদিন ধরে কেন্দ্রের কার্যক্রম ও অগ্রগতির পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে আনন্দিত হন। ঐদিন সান্ধ্য আলোচনা চক্রেও তিনি উপস্থিত থাকেন ও ভাষণ দেন।

কেন্দ্রের শিক্ষণ-অধিকর্তা স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী কেন্দ্রের প্রথম পর্বের যে কার্য বিবরণী প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, শিল্পকর্ম ও কর্মপ্রকল্প হাতেনাতে শিক্ষা দান সূত্রে সাবান, মধু, নানান চিত্তাকর্ষক মৃৎপাত্র, হাতে কাটা সুতো প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে ১০০ কে. জি. সাবান কে. জি. প্রতি ৪'৫০ হারে এবং ১৩ কে. জি. মধু কে জি প্রতি ৫ টাকা হারে বিক্রি করে কেন্দ্র ৬৪৫'০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

সুরেশ্বরানন্দজী তাঁর বিবরণীতে আরও একটি আনন্দ সংবাদ পরিবেশন করেছেন যে, দ্বিতীয় পর্ব থেকে এই কেন্দ্রে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হাতে চালানো তাঁত ও হাতে তৈরী কাগজের দুটি প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কর্মশিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র গঠনে প্রবোজক প: ব: মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, রাজ্যসরকার শিক্ষা বিভাগ, প: ব: খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সংস্থার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা কর্মভিত্তিক মধ্যশিক্ষা রূপায়ণের পথকেই সুগম করবে নিঃসন্দেহে।

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Dev

-[In the last issue the author started A. T. Jersild's "Child Psychology" and dealt with the followings :
Life as a form of striving, views about growth, factors governing development of Child's Capacities, growth factors in establishment of basic co-ordinations, studies of effects of training in relation to maturity, the paradox of the self, meaning of maturity, development as a product of learning and growth maturity level, developmental revision of habits, archaic behaviour trends, anticipation, behaviour before and after birth, activity before birth, behaviour at birth, special senses, emotions, hunger etc.]

Living and Learning in Infancy :

Emotional intimacy of the child with his parents is the first foothold of his developing personality. Children show differences of individuality from their very birth. The child's personality is affected by the adult ways of behaviour with the children.

According to this author the behaviour of a father towards his child reflects to some extent his own nature.

This line of connection of the child with the adults, the emotional linkage is called empathy by Sullivan.

A child needs freedom and discipline both for his development. But discipline is bad when it is coercive, unduly severe and not meant to help the child to have useful control over his actions that lead to trouble. It is good or bad in its appropriateness.

Some sort of discipline is necessary and these should be healthy, that is, with an aim to some ultimate effects.

The discipline imposed by an adult expresses his own mental bearing.

The discipline may be to child an object of grievance ; discipline introduces sometimes a sort of friction between the home and the society as when one home introduces a system of regular habit, for a child, while another doing nothing of the sort. Again there may be hitch between the home and the school. But such frictions may be less serious in the long run. But in the later life it becomes a self discipline. Self discipline should not be unwise, unhealthy or bad.

Education is something that comes from within and discipline is something that is imposed from outside. As we grow older we impose less and less discipline and more and more education and in private life it is more of the nature of self realisation.

Punishment for the sake of punishment is of no value and this used for the sake of

encouraging some positive attitude is of almost no value. But punishment to prohibit the child from something unwanted is useful. But the punishment should be directed with a good end to be really effective. Moreover it should be less vague, more direct and more complete. The punishment effect depends on the relationship between the giver of the punishment and the child that receives it.

Thumb Sucking :

Thumb sucking is another process in infancy. There are theories of thumb sucking. Sucking, according to some, like Levy, is that children suck the thumb in response to an oral drive. Some think that it is to get some pleasure associated with getting nourishment though there be no good substance.

Some again think this habit as some expression of an erotic stimulation. The lips, tongue and mouth have a larger function in the life of the child. Others think that they are the mechanism through which the child expresses himself and is in contact with the outer world. Chewing is also an early process in infancy which comes later.

Spontaneous food demands :

Infants demand food and they have selection, to make. Children in early infancy show a wisdom and logic as to when and how and what to take.

In later infancy there is no absolute system of control to choose between what is demanded of the mother by the child and what is demanded by the mother. The idea is to respect the child's own needs and to underscore the mother's. In fatigue and ailment the wisdom of the body is vindicated. Again food pressures and food refusals can be expressions of unhealthy tendencies within the child or the adult. There may appear food preferences in a child but this attitude may be consistent with his other behaviour and may be the sign of an attitude of defensiveness or suspiciousness that can take any other outlet There are feeding problems that may range from mildly perplexing to severe annoyance or anxiety that perplexes the parents and the people around, and is also a cause of trouble to the child.

"The doctrine of reincarnation alone can explain satisfactorily and rationally the divinities among children.

* *

You have infinite potentialities and possibilities. Parents ought not to have children unless they know how to rear them."

WHAT I WANT

[*Translated from* **Sri Archanapuri's** *Bengali poem* **"Kee chai"** *by* **Sri Jyotsna Nath Mallik**]

This very earth sunshine-spattered,
this is me
Coated in deadness of a handful of dry grass-
flowers
I hear your sky bound message.
My expanse is limited by boundaries.
I want my journey's way
to be shortened still.
Every footstep of mine is tuned to weariness
But your destination is the infinite.
Do you want to give me
the directions of that address ?
Still to me it remains unknown.
The morning sky with pigeons on wings,
light seeping down,
in the face of distant fragments of motionless
green patches
the motion of ups and downs of life
along the uneven road,
all around are scattered heaps of stones,
they are the smiles and tears of mine,
I want to gather them in my palm.
In my wayfaring, these fragile necessities
I want to collect in the leafy bowl of my heart.
In its breath I want to hear with eager ears
the murmurs of the celestial river.
Oh my guide, it is on that day to be fulfilled
the love of the infinite in finite heart.

ART AND LIFE

Bhaskar Acharya

Art offers us a glimmer of reality. It presents not life but an illusion of life, not reality but an illusion of reality. Art offers us a likeness, semblance verisimilitude of life This produces an impression of simultaneous nexus and remoteness.

Art, according to Aristotle, is imitation, i. e. an idealisation, a reconstruction, an objectification, a dramatization, an eternalisation. Life is the raw material, art is the finished product : life is the staple of art

Artistic truth is distinct from factual truth. The truth of literature is not to be taken literally. The truth of life is characteristically different from the truth of art. In poetry truth is presented in a certain way and that is poetic truth which obviously differs from actual truth. Plato may be recalled : the purpose of art or of poetry should be not only pleasure but morally ennobling also. Hence his condemnation of poets or artists. Aristotle's point is that the poet's task is to deal not with the actual or factual truth,— not with what happens but with what may happen. So the subject of art or poetry is not fact but fiction or an imaginative reconstruction of fact. Plato banned art in the interest of life. For him the best interest of life is the realisation of truth. Art is hostile to it It is a distortion of truth.

This main problem relating the relationship between art and life may be put in thus : is the world, created by the artist, a reproduction or copy of our actual experience, or is it a different world ? The difference in medium constitutes the essential difference between life and art, also between art and craft. A rose in the garden exists in the nature where as a painted rose exists in the medium of art (here medium is colour). An actual bird is made of flesh and blood and feathers, whereas a bird painted on the canvas is made of colour ; Keats's Nightingale and Shelley's Skylark are made of words. A carpenter can produce an exact imitation of a given table, if he is supplied with the same materials, but a table on the canvas would be a different table in substance as the medium or material would be different.

In visual arts (painting and sculpture) an attempt is made to produce a similar appearance of a thing imitated, although the substance will be different.

Life is a chaos, art has a pattern. Things happen in life in a haphazard way— without link, order and connexion, whereas in art things do not stand isolated, they present a neat pattern. The fundamental aim of art is to impose order on chaos. The world of art is regulated by laws of causality, coherence, an inner consistency. In a work of art each part must be organically related to the whole : nothing that is essential is left out and nothing that is superfluous is retained. There is no place for accidents or coincidence in art.

Art has pattern also in the sense that it has a beginning, a middle and an end. Life is often inclusive. It has no pattern.

Landscape-painting or animals have no place in Aristotle's *Poetics*. In his opinion art is an imitation of human actions. And art must have a relevance to life– no life, no art. Escapist literature also has certain connections with life. Art takes its materials from life yet the difference is vivid between them. But art-world is not a fantastic world completely divorced from reality.

Art is unquestionably one of the purest and highest elements in human happiness. It trains the mind through the eye, and the eye through the mind. As the sun colours flowers, so does art colour life.

"In true art," says Ruskin,

together."

Life is intimately associated with art. Every artist is concerned with life. And very artist has his own view of life. No artist's view of life can be a truthfull view of life. Life in the true sense elludes literature. Artists record in art their own impressions. Each artist looks life from different angles. Art does represent life. Life is remade into art. Art and life keep contact with each other. When art stays apart from life it becomes much too artificial, it becomes an airy none ; such an art is lifeless abstraction. An excessive contact with life makes art a mechanical copy of life. The departure from life must not amount to a total break. Escapist art perishes of sheer emptiness. There is a theory of "art for art's sake". So far the author is concerned art is not for the sake of art. For the reader art is for the sake of life. Mere artist is a pitiable man. Art is an echo of life. It becomes part of life. Our impressions of life are deduced partly from life and partly from art. Oscar Wilde says that life is an imitation of art. We read literature and order our life accordingly. Our study of art affects our behaviour.

The body of art has become a part of life. In one sense life-experience includes art-experience. When Arnold says that poetry is a criticism of life, he means literature. In Byron's view fact is stranger than fiction. Fiction in art must look probable and causal whereas fact of life may be chaotic. The universe of art and the universe of life are governed by different logics.

Art can give artistic pleasure, and it can be beautiful when it becomes a transmutation,—an imaginative reconstruction of life,—and this artistry depends largely upon the process of selection, rejection and addition of the artist. The function of an artist is not to deal with facts as such, but to select probable events and to arrange them in a necessary order. Herein lies the distinction between poetic truth and factual truth. Sophocles' *King Oedipus* can be cited as an illustration in this connection : the entrance of the Corinthian Shepherd ; he came not by the command of the king ; there is no causal relation between the character of Oedipus and the arrival of the shepherd. This is just a coincidence and such coincidence often occurs in life. At any rate it looks probable in the play. Hence the distinction between factual possibility and poetic probability.

BHABMUKHEY

A creative artist gives us an imaginative reconstruction of reality. Alterations, changes in the creation of both characters and incidents are obviously called for. What is impossible in life may take place in a work of art when the writer can produce conviction in the reader. If the artist wants to deal with something improbable he must have the skill to lend it an air of credibility Let us take an example : jealousy is not a very unnatural thing in itself. But no story can be more absurd than that of *Othello*, because a loving husband in our everyday life cannot kill his wife in a fit of jealousy within less than twenty four hours of their first night together. Yet thanks to his own skill of creating conviction Shakespeare makes the improbable look absolutely probable. The causal sequence must not be violated in order that the impression of probability may be created. So in a successful work of art the author binds the incidents in a chain of necessity that the probable appears to be more convincing than the actual : the things that might happen produce a stronger impression of truth than things that do happen.

Life is the ultimate source of art. Art takes its origin in life. Life includes art which is a part of it. Life has no attested copy, it is original. Life is the archetype—art has so many forms—Music is one, Sculpture is one.

Art is an ordering of experience. The stream-of-consciousness-writers say that there is no difference between art and life ; art imitates not eternal events but the inner reality of consciousness. Consciousness is a flow ; what occurs in mind matters most.

Aldous Huxley warns us against making any facile equation between art and life Art can be life-like but not life.

Life is an amorphous mass of experience. Life is a chaos ; the artist brings order upon chaos. That artist is the greatest one who can produce the strongest illusion. Aristotle attaches to art the distinction of higher reality. All artists present their individual interpretations of life. Aristotle says that art imitates life According to Oscar Wilde life copies art. It is a rejoinder to Aristotle. The great artists like Shakespeare create strongest illusion. The successful artist so transmutes his materials as these materials undergo a sea-change beyond recognition. Shakespeare, by virtue of his treatment, achieves the supreme success in art, working on the unpromising materials of life.

"The secret of Greek art is its imitation of nature even to the minutest detail ; whereas the secret of Indian art is to represent the ideal. Art must be in touch with nature ...yet it must be above nature. "Art unveiling nature".

—Swami Vivekananda

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by .—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22

Gram "DEVGLASS" PHONE 45-0125 (3 Lines)

WORLD PHILOSOPHY

by

Swami Satyananda

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M. A., Ph. D

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও কমলা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৯ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৩৪-২০৮৪ মুদ্রক ও প্রকাশক-স্বামী উমানন্দ

প্রতি সংখ্যা ·৭৫ পয়সা। বার্ষিক মূল্য টাঃ ৮·০০

No. ITB/NC-34 • BHABMUKHEY • Phone 56-2770

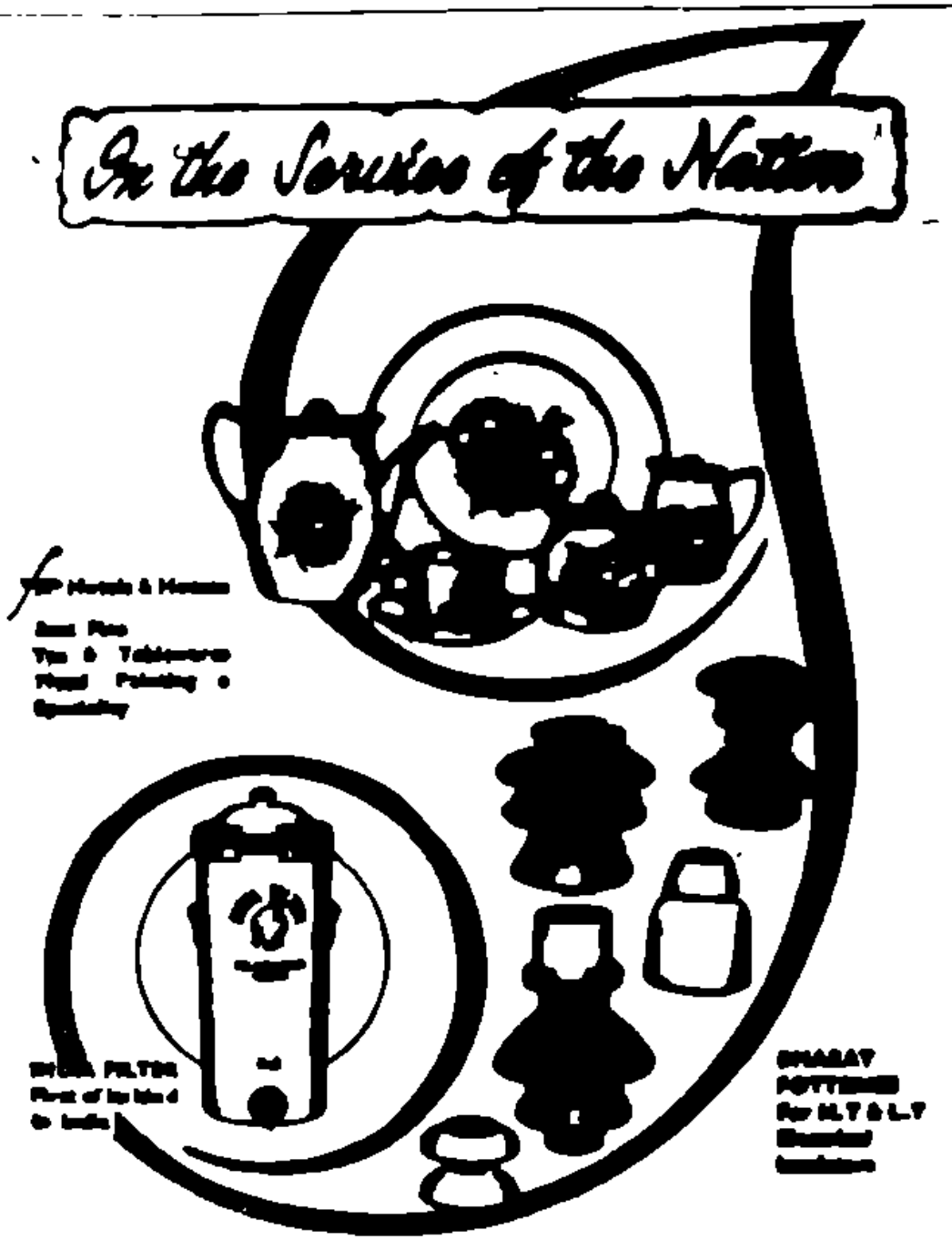

Manufacturers & Exporters

INDIA POTTERIES LIMITED

9, SHAKESPEARE SARANI, CALCUTTA-20

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

প্রচ্ছদ-শিল্পী :—প্রঃ শঙ্কর চৌধুরী। মুখ-পত্রিকা সচিব—স্বামী অরূপানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। মুখ-সম্পাদক—স্বামী শীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ-সম্পাদক—স্বামী হীরানন্দ ও স্বামী মৃদানন্দ। প্রচার সচিব—স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী ভক্তেশ্বরানন্দ স্বামী অরূপানন্দ ও প্রঃ তারক চৌধুরী।

যুগপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের পঞ্চসপ্ততিতম শুভ জন্মজয়ন্তী স্মরণে

ভাবমুখে

ফাল্গুন ● তেরশ তিরাশি ● ত্রিংশৎবর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ● সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • কটক • ধানবাদ • পাটনা • শিলিগুড়ি • গৌহাটী

●

ASK FOR

ORPHAN'S TEA

For

Health & Economy

ORPHAN TEA FEDERATION

123, Cornwallis St. Dharamtala

Phone : 55-3104

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত] মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D.RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CALCUTTA
PHONE : 34 - 5711

★

ডি. রতন & কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৫৭১১
২২-১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

১। জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ভাবমুখে'র বার্ষিক চাঁদা যাঁহাদের এক বৎসরেরও উর্দ্ধে বাকী পড়িয়াছে এবং এই বিষয়ে একাধিকবার পত্র দ্বারা স্মরণ করানো সত্ত্বেও যাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের নাম ও দেয় অঙ্কের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বৎসরের চৈত্র মাসের মধ্যে তাঁহাদের বকেয়া চাঁদা অতি অবশ্য পাঠাইয়া দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই বিজ্ঞপ্তির পরও বাকী চাঁদা দেওয়া না হইলে আগামী বৈশাখ ১৩৮৪ হইতে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে ভাবমুখে পাঠান বন্ধ করিতে হইবে।

গ্রাহকের নাম	টাকা
A. 18 শ্রীমতী অতসী দাস, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিঃ	১৭'০০
A. 78 শ্রী এ. কে. চ্যাটার্জী, হরিশপুর, হাওড়া	২৪'০০
B. 9 শ্রীবঙ্কিম দাস, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা	১৬'০০
B. 10 শ্রীঘটক্রুক কোলে, খালিয়া, হাওড়া	
B. 11 শ্রীভাগবত সরকার, অণ্ডাল	
B. 13 শ্রীবিশ্বশান্তি দত্ত, কাঙ্কোরাগ্রাম	
B. 19 শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস, খাইখিরা	
B. 20 শ্রী বি এন. ভট্টাচার্য, বরাকর	
B. 26 শ্রীমতী বাদল রাণী ঘোষ, কুসুণ্ডা, ধানবাদ	
B 27 অধ্যাপক বি. বি. গোস্বামী, কলিকাতা-৫	
B. 44 শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত, খড়দহ	
B. 45 শ্রীমতী বকুল সাহা, কলিকাতা-৯	
B. 48 শ্রী বি. জি. মুখার্জী, কুসুণ্ডা	
B. 60 শ্রীবৈদ্যনাথ দে, তমলুক	
B. 64 শ্রীভবানীচন্দ্র কাপাস, অরিত	
B. 69 শ্রীমতী বীথিকা ব্যানার্জী, কোন্নার	
B. 71 শ্রীমতী বীণাপাণি দেব, চাকদহ	
C/o শ্রী এস. বি দেব	
C. 4 শ্রীমতী ছায়াদেবী, এস পি.চৌধুরী, কানপুর-২	১৬'০০
D. 31 শ্রীদেবেশচন্দ্র সাহাদালাল, বহরমপুর	১৬ ০০
G. 18 শ্রীগৌর প্রসাদ মুখার্জী, কুণ্ডলা	১৬ ০০
G. 22 শ্রীগজেশ রায়, কুলটি	১৬'০০
J 4 শ্রীমতী ইলা দেবী, এস. ভট্টাচার্জী, শাঁতরাগাছি	১৬'০০
J. 13 শ্রীজ্যোতি শঙ্কর মুখার্জী, কুণ্ডলা	১৬ ০০
J. 16 শ্রীজয়ন্ত ঘোষ হাজরা, হাওড়া	
K 4 শ্রীকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা-১৯	
K 6 শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, কলি-২	
K. 17 শ্রীকার্তিক কুমার, বম্বে-৫৪	
K. 24 শ্রীকিশলয় ঘোষ, কলি-২৮	
L. 6 শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ভা, শ্রী এস. কে ভা, বর্ধমান	
M 20 শ্রীমতী মনোরমা ঘোষ, শ্রী এস. কে, ঘোষ, বোলপুর	
M. 26 শ্রীমুকুল প্রকাশ ব্যানার্জী, কলি-১৪	
M. 28 ডাঃ মোহিত মোহন দাস, কাশী	
N 5 শ্রীনেপালচন্দ্র সাহা, বরিষা, কলি-৮	
N. 16 শ্রী এন. সি. হোড়, দমদম ক্যান্ট	
N 26 শ্রীনবগোপাল বসু, কলি-৩৬	১৬'০০
27 শ্রীনরেন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, নতুনহাট	১৬ ০০
N 28 শ্রীমতী নিলীমা বোস, কুলটি	১৬'০০
P. 11 শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্ত, সিওরাল	৪৪'০০
P. 39 শ্রীপান্নালাল শ, কালীনাথ দত্ত রোড. কলি-৩৬	১৬ ০০
P. 42 শ্রীমতী পারুল রাহা, কলি ২৭	১৫'০০
R. 3 শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার, কলি-১৫	১৬'০০
R. 25 শ্রীরবীন্দ্রলাল চৌধুরী, মাদ্রাজ-১	১৬'০০
R. 41 শ্রীরণজিৎ কুমার সরকার, নৈহাটী	১৬'০০
R 42 শ্রীরণধীর মুখার্জী, মাদ্রাজ	১৬ ০০
R. 47 শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস, তুফানগঞ্জ থানা কুচবিহার	১২'০০

গ্রাহকের নাম	টাকা
S 23 শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জী, অণ্ডাল	১৬·০০
S 52 শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত, গরিয়া	১৬·০০
S 67 শ্রীসুধীরচন্দ্র নিয়োগী, মথুরাবাগান	১৬·০০
S. 83 শ্রীসুশীল চক্রবর্তী, আসা	৪·০০
S. 102 শ্রীসুজিৎ কুমার দে, শিলং-৪	
S. 109 শ্রীসুবোধ কুমার দাস, জগদ্দল	
S. 116 শ্রীসমীর কুমার বোদক, পাঙ্গুলীপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৭	
T. 4 শ্রীতারাপদ রায়, বর্ধমান	
U. 1 শ্রীমতী উষারাণী আচার্য, শ্রী এস. এন, আচার্য্য পূর্বপুটিয়ারী	১৬·০০

২। জরুরী বিজ্ঞপ্তি

যাঁহাদের ১৩৮৩ সালের ভাবমুখের চাঁদা এখনও ভাবমুখ কার্য্যালয়ে জমা পড়ে নাই তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এতদ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৩৮৩ সালের বাকী চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া 'ভাবমুখে'র কার্য্যে সহযোগিতা করুন।

গ্রাহকের নাম	টাকা
A. 12 শ্রীঅশোক বোথরা, বীরপাড়া	৮·০০
A. 15 শ্রীঅসিত বোস, কলি-১৯	৮·০০
A. 32 শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, গোরাবাড়ী	৮·০০
A. 40 শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর কবিরাজ, কুলটি	৬·০০
A. 42 শ্রীঅনাথবন্ধু ঘোষ, ধোরী	৮·০০
A. 43 শ্রীএ. এন্. চৌধুরী, পাটনা	৮·০০
A 48 শ্রীঅনিমেষ মুখার্জী, কুণ্ডলা	৮·০০
A 57 শ্রীঅনঞ্জন কুমার পাল, বম্বে	৯·০০
A. 72 শ্রীমতী অমিয়বালা চক্র, শ্রীখণ্ড	৮·০০
A. 87 শ্রীমতী অনিতা চৌধুরী, বরানগর	৮·০০
A. 88 শ্রীঅশোক গাঙ্গুলী, কলি-১৯	২·০০
A. 95 শ্রীএস. কে ঘোষ, মুজাফরপুর	৮·০০
A. 97 শ্রীঅমল ব্যানার্জী, কলি-১২	৮·০০
A. 99 শ্রীঅক্ষয় কুমার মণ্ডল, কলি-৫০	৪·০০
A 102 শ্রী এ কে. মিত্র, পাণ্ডবেশ্বর	২·০০
A. 103 শ্রীঅনাথ নাথ মুখার্জী, পাণ্ডবেশ্বর	২·০০
A. 104 শ্রীঅমলেন্দু ব্যানার্জী, পাণ্ডবেশ্বর	৬·০০
A. 107 শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার, গোরাবাড়ী	৪·০০
A. 110 শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, কাত্তাসরা	৮·০০
A. 115 শ্রীমতী অঞ্জলি মজুমদার, বোলপুর	৬·০০
B. 17 শ্রীভাগেন্দু সাহা, বাতিকার	৮·০০
B. 40 শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, কলি-৩১	৮·০০
B. 41 শ্রীবসন্ত কুমার দে, সিউড়ী	৮·০০
B. 51 শ্রীমতী বন্দনা মুখার্জী, বাঁশজোড়া	২·০০
B 78 শ্রীবিশ্বনাথ চেল, সোনামুখী	৪·০০
B 79 শ্রীমতী বীণাদাস শর্মা, পটওয়ারসাই	৬·০০
B 84 শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, নবসন	৬·০০
B. 86 শ্রীমতী বাণী চ্যাটার্জী, বেলেঘাটা	৮·০০
C. 3 শ্রীচঞ্চল চন্দ্র, সাঁইথিয়া	৮·০০
C 5 শ্রীমতী চারুবালা সেনগুপ্ত, বম্বে	
D. 3 শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলি-৯	
D. 11 শ্রীদেবপ্রসাদ কর, পাণ্ডুয়া	
D 16 শ্রীধীরেন্দ্র লস্কর, কলি-৩৬	
D 18 শ্রীদিলীপ কুমার চন্দ্র, রামপুরহাট	
D. 29 শ্রীদুলাল চন্দ্র ঘোষ, দুর্গাপুর-৮	
D. 37 শ্রীদুর্গাপতি মুখার্জী, কারুয়া	

গ্রাহকের নাম	টাকা
D 38 শ্রীদুলাল কৃষ্ণ দত্ত, কাজোরাগ্রাম	২·০০
D. 40 ডা: দীপঙ্কর সেন, পাণ্ডবেশ্বর	৬·০০
G. 9 শ্রীগদাধর রায়চৌধুরী, বাঙ্গলা	৮·০০
G. 11 শ্রীমতী গীতারাণী গুপ্ত, কলি-২৯	৮·০০
G. 19 শ্রীগোপেশ্বর সাহা, কলি-১০	৮·০০
G. 21 শ্রী জি. জি ভট্টাচার্য্য, দুর্গাপুর-৮	৮·০০
G. 24 শ্রীগৌর মিত্র, কলি-৩৬	৮·০০
H. 15 শ্রীহীরেন্দ্র নাথ হালদার, কলি-৫	৮·০০
I. 1. শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য, ভবানীপুর	৮·০০
I. 6 শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্তী, সাঁইথিয়া	৮·০০
J. 10 শ্রী জে এন. ব্যানার্জী, ভাগলপুর	৪·০০
J. 21 শ্রীজগজীবন পুজারা, বেলদা	৮·০০
J. 26 শ্রীজিতেন চ্যাটার্জী, পাণ্ডবেশ্বর	২·০০
K. 40 শ্রীমতী কমলিনী দেবী, চিত্তরঞ্জন	৮·০০
K. 42 শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহোরা	৮·০০
K. 46 শ্রীকিঙ্কর বিপুলানন্দজী, কলি-৩৫	৮·০০
K. 47 শ্রীমতী কবিতা মিত্র, কলি-৩৫	৮·০০
K. 51 শ্রীকালী কুমার ব্যানার্জী, পাণ্ডবেশ্বর	৬·০০
L 8 শ্রীমতী লোলিতা ভোদী, পাটনা	৮·০০
M 13 শ্রীমতী মায়া চক্রবর্তী, কুলটি	৮·০০
M. 22 শ্রীমতী মনোরমা দেবী, কলি-১৪	৮·০০
M. 27 শ্রীমনোজ হাজরা চৌধুরী, দুর্গাপুর-৯	৮·০০
M. 30 শ্রীমিলন দে, ঘোরাতোর	৮·০০
M. 48 শ্রীমানস নাথ সাধু, কলি-৭	৮·০০
M. 52 শ্রীমতী মৃদুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পতিতপুর	৪·০০
M. 55 শ্রীমতী মাধবী পাল, কলি-৬	৫·০০
N. 19 শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জী, কলি-৩২	৮·০০
N. 31 শ্রীননী মজুমদার, বর্ধমান	৮·০০
N 37 শ্রীনিবারণ চন্দ্র মিত্র, নবসন	৮·০০
N. 49 শ্রীনিত্যানন্দ রায়, বোলপুর	৮·০০
N. 53 শ্রীনিরোদ বরণ কুণ্ডু, পুরুলিয়া	২·০০
N. 54 শ্রীনরেন্দ্র নাথ সরকার, ধানবাদ	৬·০০
N. 56 শ্রীমতী নীতা মজুমদার, পিওরকাজিলা গ্রাম	
কোলিয়ারী	৪·০০

গ্রাহকের নাম	টাকা
N 57 শ্রীনেমচাঁদ কারনানী, জোরহাট	৪·০০
P. 6 শ্রীপীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়	
P. 7 শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ, কান্দি	
P. 12 শ্রীপ্রতাপ কুমার রায়, কলি-২৯	
P. 28 শ্রীপরেশ নাথ দাস, কলি-৩০	
P. 31 শ্রীপরিমল চন্দ্র সিংহ, বিষ্ণুপুর	
P. 47 শ্রীপ্রণব কুমার সুর, কলি-৫	
P. 48 শ্রীপাচুগোপাল লাহিড়ী, শ্রীরামপুর	
P. 49 শ্রীমতী পূর্ণিমা মজুমদার, কলি-৬৩	
P. 51 শ্রীপুলকেশ চট্টোপাধ্যায়, জগদ্দল	
P. 53 শ্রীপ্রণব কুমার দত্ত, কলি-৫	
P. 57 শ্রী পি. আর. কেজরিওয়াল	
P. 61 শ্রীপাচকড়ি মুখার্জী, পাণ্ডবেশ্বর	
P. 62 শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দত্ত, ধানসর	
R. 37 শ্রীরামপদ পাল, দুর্গাপুর-৮	
R 40 শ্রীরতন কুমার ঘোষ, দুর্গাপুর-২	
R. 51 শ্রীরমনীকান্ত দেবনাথ, কলি-৪৮	
R. 52 শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার, ঝিরিকপুর	
R. 56 শ্রীমতী রাধা মিত্র, কল্যাণী	
R 59 শ্রীমতী রীণা মহাপাত্র, এড়িয়াদহ	
S. 9 শ্রীসুকুমার চ্যাটার্জী, গড়িয়া	
S. 15 শ্রীসমর ঘোষ, কলি-২৬	
S. 29 শ্রীশ্যামাপদ মিত্র, মহম্মদবাজার	
S 30 ডা: শ্যামসুন্দর পাল, সাঁইথিয়া	
S. 40 শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, পাটকেবাড়ী	
S. 41 শ্রীশৈলেন্দ্র নারায়ণ শীল, কান্দি	
S. 42 ব্রহ্মচারিণী সুধা মা, বুনিয়াদপুর	
S. 55 শ্রীসুরীশ চন্দ্র মুখার্জী, কলি-২৫	
S. 58 শ্রীসুনীল কুমার চ্যাটার্জী, বার্ণপুর	
S. 63 শ্রীমতী শ্রীপূর্ণা বোস, কলি-১১	
S. 65 শ্রীশিরিশচন্দ্র নন্দী, সিউড়ী	
S 66 শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সিউড়ী	
S. 68 শ্রীসাগর চক্রবর্তী, উখরা	

গ্রাহকের নাম	টাকা
S. 74 শ্রী এস. কে. সেন, কলি-১৯	৮'০০
S. 75 শ্রীসুরেশ চন্দ্র সরকার, কোচবাড়ী	৪'০০
S. 79 শ্রীসুশীল কুমার বোস, ভাটপাড়া	৮'০০
S. 94 শ্রীশান্তিনাথ রায়, কুলটি	৮'০০
S. 97 শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলটি	৮'০০
S. 106 শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য, কলি-৪	৮'০০
S. 113 শ্রীমতী সীমারাণী রায়, জিয়াকপুর	৪'০০
S. 122 শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বক্সী, সিউড়ী	৪'০০
S. 123 শ্রী এস. কে. সিনহা, উষরাদিহি	৬'০০
S. 126 শ্রী এস. আর. বাসু, দুর্গাপুর-৮	
S. 128 শ্রীসমীর কুমার ধর, কান্দি	
S. 145 শ্রীসন্তোষ কুমার মুখার্জী, আঁচল-মৌরী	

গ্রাহকের নাম	টাকা
S. 148 শ্রীমতী সুনীতি চক্রবর্তী, গাইঘিরা	৪'০০
S 149 শ্রীসন্তোষ কুমার সেনগুপ্ত, বোলপুর	৮'০০
S. 160 ডাঃ সাতকড়ি মুখার্জী, উষরা	৬'০০
S. 161 ডাঃ সুধাংশু মিত্র, উষরা	৬'০০
S. 163 শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ্য, কলি-৫	২'০০
S. 165 শ্রীসুরেন্দ্র সিং দুগর, উত্তরপাড়া	
T. 15 শ্রীতপন মুখার্জী, কলি-৬০	
T. 20 শ্রীতৃপ্তি রঞ্জন মিত্র, নবসন	
T. 21 শ্রীতপতী রঞ্জন চ্যাটার্জী, পাণ্ডবেশ্বর	
U. 2 শ্রীউত্তম ভারতী গোস্বামী, কলি-২৭	
U. 6 শ্রীমতী উমা চক্রবর্তী, অশোকনগর	

৩। জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সকল গ্রাহকদিগের নিকট একটি অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন ভাবমুখের ১৩৮৪ সনের বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ '৮৪ সনের মধ্যেই পাঠাইয়া দিয়া ভাবমুখের কার্যের সহায়তা করেন।

ভাবমুখের চাঁদা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে :

স্বামী হীরানন্দ, 'ভাবমুখ'
২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬

ভাবমুখ সম্বন্ধে :

"ভাবমুখ পত্রিকা পড়ে আমি মানসিক শান্তি পাই এবং পত্রিকাটি জীবনের চলার পথে সুষ্ঠুভাবে চলতে দারুণ ভাবে সাহায্য করে। তার জন্য আমি উক্ত পত্রিকাটির আসার পথ চেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি।"

লিখেছেন (গ্রাহক নং H. 20) শ্রীহারাধন বল্লভ,
মাধাভাঙ্গা গ্রুপ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই,
মাধাভাঙ্গা, কুচবিহার।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দ
ফাল্গুন : একাদশ সংখ্যা

সুধা বাণী

জন্ম জয়ন্তী পূর্তি
দ্বিংশৎ বর্ষ : তৃতীয় ত্রৈমাসিক

শুভ জন্মদিনে	৩৬৯	শ্রীশ্রীঠাকুর
ধন্য নর রূপান্তর	৩৭০	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
শ্রবণ-মঙ্গলম্	৩৭১	সাধনাপুরী
ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নারায়ণ	৩৭৫	যোগদাপুরী
গোপাল সোনা	৩৭৭	স্বামী মৃগানন্দ
প্রতীক্ষা	৩৮২	ব্রঃ সত্যশীল চৈতন্য
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা	৩৮৩	শ্রীশরণাপুরী
শ্রীসত্যানন্দ মহোৎসব	৩৮৪	স্বামী হীরানন্দ
শরৎচন্দ্রকে	৩৮৮	হেমকুমার মুখোপাধ্যায়
হরিণ শিশু	৩৮৮	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব	৩৮৯	ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু
গান	৩৯০	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও গোপাল	৩৯০	সুধেন্দু মল্লিক
শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি ছড়া	৩৯১	
বেদছন্দার ছন্দে	৩৯২	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব তিথি উৎসব		ব্রঃ তারক চৈতন্য
আরও আছে		শিবরাম পণ্ডা
স্বামী সত্যানন্দ—সাধারণের কাছে		অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য
বাতিকার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীসত্যানন্দ জন্ম-জয়ন্তী উৎসব	৩৯৭	
যুগপুরুষ শ্রীসত্যানন্দদেবের আবির্ভাব উৎসব	৩৯৮	স্বামী হীরানন্দ
ও ফাগুন	৪০২	মীরা রায়
আবার এস নামি	৪০৩	স্বামী অরূপানন্দ
দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৪০৭	
শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি	৪০৬	ডাঃ নদীয়া বসু
পূজা সর্বোত্তম	৪০৮	কণপ্রভা ভাদুড়ী
আশ্রম সংবাদ	৪১০	
গঙ্গাদুলালী নাটক		শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
World Psychology	81	Sreemat Swami Satyananda Deva.
On Reading "A Sheaf of Waves"	83	S. N. Chakraverty
Fundamentals of Shakta-Sadhana	100	Sri S.N. Bagchi.

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA.
CALCUTTA-56

Phone :

ফোন : ৩৪-১৯৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

• আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী চৈত্র, ১৩৮৩

১৫ই মার্চ্চ,	১লা চৈত্র,	মঙ্গলবার	—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
১৯শে „	৫ই	শনিবার	—অমাবস্যার হোম।
২৭শে „	১৩ই	রবিবার	—বাসন্তী পূজা
২৮শে „	১৪ই	সোমবার	— অন্নপূর্ণা পূজা
৩১শে „	১৭ই	বৃহস্পতিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩রা এপ্রিল	২০শে	রবিবার	—পূর্ণিমার হোম
১৩ই	৩০শে	বুধবার	— চৈত্র সংক্রান্তি ও সন্ধ্যায় বর্ষশেষের হোমানুষ্ঠান

• বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM DISWASHING

PHONE : Office : 24-1236
Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-16
Works 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

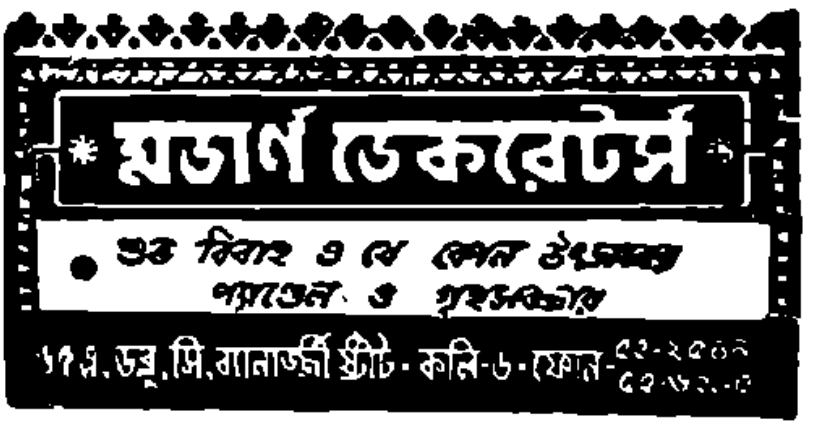

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বাবাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-১

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

—•:•—

৮৯ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : { ৩৫-৪১২৪ / ৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

নূতন দিগন্তে

দেবব্রত বিশ্বাস

সঙ্গীত জগতে নূতন অবদান

দিব্যগীতি

রচনা

মহাসাগরের ডাক শুনেছি যে
বেলা শেষের বাঁশী ওগো
} স্বামী সত্যানন্দ

অনেক রক্ত ঝরেছে মাটির বুকে
আলোর চোখের আলো
} শ্রীঅর্চনাপুরী

সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায়
শ্রীপ্রবীর মজুমদার

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্-এর
45 R. P. M. এক্সটেণ্ডেড প্লে রেকর্ড
25242/25243 LH 163
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ পি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৩৬—এখানেও পাওয়া যায়।

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

ALSO

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS

OF

ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

Head Office :
N G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 47-5248

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate.
P.O. Balitikuri
Howrah. (*West Bengal*)
Telephone : 66-4843

ত্রিংশৎ বর্ষ | তেরশ' তিরাশি | ফাল্গুন | একাদশ সংখ্যা

শুভ জন্মদিনে

শ্রীশ্রীঠাকুর

চিত্ত সন্নত যে
শুভ জন্মদিনে
দয়া কর গদাধর
দীন জনে ॥

কণ্টক ক্রন্দিত অন্ধকারে
বসুদেব বিড়ম্বিত ধরা পরে
কর শৃঙ্খল মোচন আজি তারে
যাচি ক্ষণে ক্ষণে ॥

দেব দেব নিষেবিত নারায়ণ
যোগ সুপ্তি ঘোর হোক অপহন
বুধিত হও যুগ তারণ
সব অন্ধমনে ॥

দ্বন্দ্ব নয় রূপান্তর

শ্রীঅর্চনাপুরী

জগতে সমস্ত অশান্তির মূলে হচ্ছে বাসনা অথচ এই বাসনার বীজ নিয়েই চলেছে তাঁর সৃষ্টি-লীলা। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন ওঠে তাহলে উপায় কি ? সর্ব্ব বাসনার নিবৃত্তিতে সমস্ত সৃষ্টির লয় ? নাকি অন্য কোন পথ আছে যার দ্বারা সৃষ্টিও রক্ষা হ'লো তারসঙ্গে বাসনাহীন অনাবিল শান্তির আস্বাদও পাওয়া গেল। ভক্ত মনের এই দ্বন্দ্ব সংকুল প্রশ্নের জবাবে আমাদের ঠাকুর দিলেন একটী ছোট্ট উত্তর যা অতি সহজ অথচ অতি গভীর—সাধক জীবনে একটি বিশেষ সাধন নির্দ্দেশ বলা যায়—"ঠাকুরই প্রেয় এবং ঠাকুরই প্রেয় হোক, এই চেষ্টা করো—প্রার্থনা করো। প্রেয় আর প্রেয়র মাঝে যে দ্বন্দ্ব আমরা নিত্য অনুভব করি সেটা তাহলে মিটে যাবে।"

সাধকজীবনে এই প্রেয় এবং প্রেয়র দ্বন্দ্ব চিরন্তন। প্রেয় অর্থাৎ যা আমাদের মনকে বাসনার রঙে রঞ্জিত করে আর শ্রেয় হচ্ছে পরম তত্ত্ব যা নির্বাসনারাজ্যের বস্তু—যাকে পেতে হলে প্রেয়কে ত্যাগ করতে হবে। তাই সাধনার সুরুতেই সাধককে তৈরী হতে হবে নেতিবাদের পথে ধীরে ধীরে প্রেয়র চাহিদাকে কমিয়ে আনতে। সাধক জীবনে এইটাই স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পড়লো বর্ত্তমান যুগের মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন অবচেতনের রাজ্যে যেখানে প্রেয়র চাহিদাই বুল, প্রেয় গৌণ। এই কারণে সাধককে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় সাধনার পথে, এবং বহু ক্ষেত্রে প্রেয়ই হয় জয়ী, তাই ঠাকুর যে পথটা দিলেন, বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে সেটা মনোবিজ্ঞান সম্মত পথ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নয় রূপান্তর। প্রেয়র মত প্রেয়কেও ইষ্টময় ক'রে নাও। বললেন ঠাকুর "সব কিছু ইষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হয়।" বলতেন, "যে যে বুল বিষয়ে মন ছুটবে ইষ্টকে ছেড়ে সেই সেই বিষয়ে ইষ্টকেই বসিয়ে দাও।" উদাহরণ স্বরূপ বলতেন, যেমন কেউ হয়তো খেলতে ভালবাসে, সে মনে মনে ইষ্টকে সঙ্গে নিয়েই খেলতে সুরু করলো। অফিসে কাজ করছে, মনে মনে ইষ্টকে বসিয়ে দিলো সামনের চেয়ারে, এমন কি প্রকৃতির রম্য আনন্দে যখন মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সে-আনন্দকেও ইষ্টময় ক'রে নিতে নির্দ্দেশ দিতেন যাতে প্রকৃতির রম্যতা দিব্যভাব হয়ে ওঠে। এমনি জিহ্বার আস্বাদনের ক্ষেত্রেও ভোজ্য বস্তুও মনে মনে ইষ্টকে নিবেদন করতে করতে দেখা গেছে কখন একসময় সে আস্বাদন ইচ্ছা খসে গেছে। এই সাধনার ফলে নিজের রূপ সজ্জাও হয়ে উঠবে ইষ্ট কেন্দ্রিক। প্রতিটি অঙ্গের অনুভূতিতেও থাকবে ভগবৎ আনন্দের অনুভূতি। এমন কি জগতের যে সবগুলি আমাদের কাছে স্থূলভাবে প্রিয় সেগুলির মধ্যেও ইষ্ট ভাবনা অথবা ইষ্টর সঙ্গেই সেই সব সম্পর্ক স্থাপন এটীও সাধনার একটি অঙ্গ। ঠাকুর বলতেন "দেখ, এ জগতের স্থূল সম্পর্কের এমন একটা মোহ আছে যেগুলি নিঃসঙ্গ সন্ন্যাস জীবনেও ছাড়া যায় না।" সত্যই, সমাজবদ্ধ মনের সংস্কার এমনি গভীর যে, সুদূর হিমালয়ের বুকেও মানুষ খোঁজে সেই সংসারের আত্মীয়গুলিকে। ঠাকুরের কাছে শুনেছি এক সর্বত্যাগী সাধুর কথা তিনি হিমালয়ের বৃক্ষ লতা পাতার সঙ্গে পাতিয়েছিলেন জাগতিক সম্পর্ক, যথা - এ আমার ভাই, এ আমার কাকা, এ আমার বাবা ইত্যাদি। অথচ এসব ক্ষেত্রে ভগবানকেই যদি সর্বস্ব করে নেওয়া যায় তাহলে জগত বন্ধনের দুঃখটি পেতে হয় না। কিন্তু সাধারণ মনের পক্ষে এটা যত সহজ মনে হয় তত সহজ হয়তো নয়। স্থূলস্থ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ স্থূলবস্তুর মধ্যেই মন আনন্দ পাবে; সূক্ষ্ম বস্তুর উপলব্ধির আনন্দ যত নিরবচ্ছিন্ন হোক না কেন তা কোন মতেই মনকে আকর্ষণ করতে পারবে না। সেইজন্য ঠাকুর বললেন, "ঠাকুরকে প্রেয় এবং প্রেয় করবার চেষ্টা করো এবং প্রার্থনা করো। এই চেষ্টা হচ্ছে সাধনা আর যাতে এই চেষ্টা সার্থক হয় তারজন্য প্রয়োজন প্রার্থনা। প্রার্থনা ছাড়া মনের গতির পরিবর্তন কোন মতেই সম্ভব নয়। জগতের সমস্ত প্রিয় বস্তুগুলিতে ইষ্ট আরোপ করার চেষ্টা করতে করতে দেখা যাবে প্রেয় আর প্রেয় থাকবে না, রূপায়িত হবে প্রেয়তে।

কথামৃতে আমরা পাই মোড় ফিরানোর কথা—কামনা বাসনাকে ঈশ্বর অভিমুখী করার কথা। আমাদের ঠাকুর এই মোড় ফিরানোটিকে আরো গভীর করে বললেন বাসনাকে অবাসনার বস্তুতে রূপায়িত করতে বা বাসনার মধ্যে অবাসনার বস্তুকে এনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা। এক কথায় শ্রীঠাকুরের এই সাধন নির্দ্দেশ সংগ্রাম ধর্মী নয়। এর দ্বারা সাধক সাধন পথে একটি সহজ স্বাভাবিক গতি পাবে এবং একদিন না একদিন প্রেয় প্রেয়র চিরন্তন দ্বন্দ্বেরও শেষ হবে। সাধন রাজ্যে দেবাসুরের দ্বন্দ্বের এ এক নবতম পরিণতি।

শ্রবণ-মঙ্গলম্

সাধনাপুরী

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

আজ রবিবার শ্রীঠাকুর বসেছেন পাঠের আসরে—গৈরিকের স্বর্ণে সুশোভিত বরতনু—নয়নে জড়ানো করুণার স্নিগ্ধ দ্যুতি—শ্রীঠাকুরের চরণতীর্থে উপস্থিত রয়েছেন সেজকা, ফটিকদা, নটু, দেবু, অরুনদা, নিত্যানন্দ (মদন), শচীন, প্রেসিডেন্ট মহারাজ, সুবোধ, অমল, মধুপুর আশ্রম থেকে এসেছেন হরিপদ কাকা (হরানন্দ) আর গৃহীভক্তদের মধ্যে মণিদাসগুপ্ত ও তার ভায়ে, গোপাল ব্যানার্জী, কালীদত্ত, অশোক, জয়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, অরুণ সেন, হিমাহরণ নন্দী, রাধানাথ দত্ত, বীরেন সেন ও তার ছেলেরা, কোন্নগরের ভক্তগণ আরও অন্যান্য কয়েকজন।

উপনিষদ, গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হলে শ্রীঠাকুর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ প্রসঙ্গে—

নূচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে নূচি হয় যদি হরি ত্যজে॥

এই বাণীটি সম্বন্ধে বললেন—

শ্রীঠাকুর—মহাপ্রভু নাম মহাত্ম্য প্রচার করে গেলেন 'হরের্নামৈব কেবলম্'—মহাপ্রভুর মত অমন কথা কেউ বলেন নি—হরিনাম, ইষ্টনামের ওপর গভীর conviction দৃঢ় বিশ্বাস! আগে তো সব ব্রাহ্মণদের খুব দম্ভ ছিল। যেহেতু সে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছে, সেহেতু সে নিরঙ্কুশ ভাবে করে যাবে যা খুশী তার প্রাণ চায়। সে যদি কোন গুরুতর অপরাধও করে তাহলেও তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলবেনা। এমনই ছিল আগেকার দিনের সমাজের নিয়ম। কিন্তু মহাপ্রভু এসে বললেন, 'ব্রাহ্মণ যদি হরিনাম না করে তবে সে ব্রাহ্মণ নয়'—আর শূদ্র যদি হরি নাম করে তবে সে শূদ্র নয়। ভগবৎ নাম কি কম! নামে দেহ মন পবিত্র হয়—মন সংস্কার মুক্ত হয়—পাপবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি কমে যায়—তবে কিন্তু নামটি ঠিক ঠিক করা চাই—জাতে উঠবার জন্য দু'চারদিন করলাম তারপর আর করলাম না—সে করলে চলবে না। বিনয়, শ্রদ্ধা আকুলতা এসবও থাকা চাই। আমি নাম করছি কাজেই আমি ব্রাহ্মণ এ অহঙ্কার যেন না আসে।

ঠাকুরের নামে আমরা সব হরিজন উদ্ধার করলাম—তো একটি মা এইসব আশ্রম মায়েরা যেখানে বসেছিল সেখানে একদিন এসে তাদের ঘাড়ে মাথায় পা দিয়ে টপকে যাচ্ছে—আমার কাছে আসবে তাদেরও আগে। তাতে একজন তাকে সাবধান করতে গেল 'এই সাধু মায়েদের গায়ে পা দিয়ে যাচ্ছিস কেন? অপরাধ হবে যে।' মা টি তখন বলে কি, 'কেন আমি তো, আমি তো ঠাকুরের জপ পেয়েছি, মায়েরা আর আমি তো এক।' নাও এখন, নিম্নশ্রেণী অশুচি ময়লা কাপড় আর সন্ন্যাসিনী মায়েরা সব শুচিশুদ্ধ হয়ে জপ করছে তাদের গায়ের ওপর দিয়ে পা বাড়িয়ে জপের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে—আমিও তো জপ করি ইত্যাদি দোহাই দিয়ে—অবশ্য সে ঠিক মহাপ্রভুর মতে ভক্ত হতে পারবে না।

ইত্যাদি কথা বলছেন শ্রীঠাকুর ইতিমধ্যে কবি নির্মল দাসের বাড়ী থেকে একটি লোক এসে সংবাদ দিলে 'নির্মল দাসের মৃত্যু হয়েছে আজই আর এই চিঠি তিনি নিজে হাতে লিখে রেখেছিলেন আপনাকে দেবার জন্য। মৃত্যু সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমার মৃত্যু হলে মৃত্যু সংবাদ ঠাকুরকে দেবে আর আমার শ্রদ্ধা জানাবে—আমার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করবে।"

শ্রীঠাকুর—(ঘর্মাহত হয়ে) সে কি অত good health অল্প বয়েস অথচ এই অকাল মৃত্যু!

তার—না ঠাকুর ইদানীং অসুখে ভুগছিলেন—

শ্রীঠাকুর—কই চিঠিটা দাও—

লোকটি চিঠিটি দিলে শ্রীঠাকুর নিজে পড়তে লাগলেন—

ঠাকুর সত্যানন্দ,

শ্রীচরণারবিন্দে,

ধ্যানযোগে জানি অবগত তুমি সত্যানন্দস্বামী
রোগ যাতনায় সন্তান এক কাঁদিতেছে দিবাযামী,
মৃত্যুর লাগি ভীত নহেক সে মরণের যাতনায়
লাখো মরণের লভিতেছে স্বাদ, এইবার ত্রাণ চায়।
কৃপা কর দেব আজের সৃষ্টি মহান সৃষ্টি হ'ক।
প্রসীদ দেবতা ভক্তের শুভ তব আশিষ অমোঘ।
ভস্ম লিখুক ঘুমায় এখানে নাম হারা এক প্রাণী।
সত্যানন্দ কহিলা শেষে আর কিছু নাহি জানি।

প্রণত
নির্মল

১লা আশ্বিন ১৩৬৭

চিঠিখানি পড়ে শ্রীঠাকুর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ও সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ কবির আত্মার কুশল প্রার্থনা করলেন।

শ্রীঠাকুর—অমন একটা প্রতিভা অকালে ঝরে পড়ল—

তার—ওর মানসিক অশান্তি বা দুঃখ কিছু ছিল আমরা জানি—যাইহোক মনটা বেশ ছিল আর আপনাকে শ্রদ্ধাও করত খুব—ওতো জীবনে কোন দেবস্থানে কোন দেব বিগ্রহকে প্রণামও করেনি। কোন গুরুজনকে বা গণ্যমান্য ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন কারোকেই সে প্রণাম করেনি—ভগবান মানতনা এমনকি মা সরস্বতীকে পূজা করেনি কোনদিন, বিদ্যালাভের জন্য বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করেনি—কিন্তু আপনাকে যেদিন নির্মল প্রথম দর্শন করল সেদিন দর্শন মাত্রেই প্রণাম করল। আমাদের কাছে বলেছিল কি জানি কেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আমার মাথা আপনিই নুইয়ে গেল—আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম—

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ আমায় বলেছিল, 'আপনার কাছে আমার স্বার্থ কিছুই নেই কেবল প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল, তাই ছুটে এলুম। ভগবান ভদ্রলোক কোথায় আছেন তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নাই—যাঁকে সামনে দেখছি তাঁকে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট।

অরুণদা - কবি নির্মল দাস তো আজীবন নাস্তিকই ছিলেন বলা যায় কিন্তু আপনাকে দর্শনের পর থেকে আপনাকেই সে ভগবান জ্ঞানে শ্রদ্ধা করত।

শ্রীঠাকুর নিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে কবির অন্য প্রসঙ্গ সুরু করলেন—

শ্রীঠাকুর—কবি নজরুলের মত বলিষ্ঠ লেখনী নির্মলের; দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর সম্বন্ধে কত সুন্দর কবিতা লিখেছিল আমার কাছে আসার পর—আমাদের ভাবমুখে পত্রিকার জন্যও চিন্তা করত, লেখা সংগ্রহ করা, বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের এখানে কবি সম্মেলনে নিয়ে আসা এসবও করত, আশ্রমকেও খুব ভালবাসত।

এইসব কথার পর ভস্ম চরণামৃত দিয়ে অমল ও তারকে ঠাকুর পাঠালেন কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও প্রার্থনা পূরণের জন্য—আর বললেন—

শ্রীঠাকুর—চিঠিটি বড় দেরীতে এলো—আমরা নির্মলের জন্য কিছু করতে পারলাম না—যাইহোক তার আত্মার কুশল প্রার্থনা আমার রইল।

শ্রীঠাকুর যোগীর পরমাত্মন হলেও তিনি যে ভক্তের ভগবান ভক্তের দুঃখ তার অন্তরে বড় ঘা দেয় তাই শ্রীমুখ বিষাদ করুন হয়ে উঠল।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

আরতি ও ধ্যানের পর শ্রীঠাকুর বসেছেন পশ্চিমের আস্থানমণ্ডপে – প্রতিপদের একফালি চাঁদ অস্তেই গেছে সরে নিঃসীম অন্ধকার আকাশে জ্বলছে অদ্ভুত তারার চুমকী—শ্রীঠাকুরের বাউল মন হারিয়ে গেছে সেই অসীম পাথারে—বেশ কিছুক্ষণ পর আপন মনে আবৃত্তি করে চললেন—

'The star kissed sky is the grandeur of heaven.'

কিছুক্ষণ পর বললেন, 'নাও এবার পাঠ কর—

শ্রীঠাকুরের কথায় সাধক জীবনী পাঠ ও গীতাপাঠ হল। শ্রীঠাকুর গীতার মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করলেন। এরপর কথায় কথায় প্রার্থনা সম্বন্ধে কথা তুললেন তার—

শ্রীঠাকুর—(গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের প্রতি) প্রার্থনাটি করে যাবে—প্রার্থনা বড় দরকার। ঠাকুরও প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা যখন জার্মানীদের কাছে হেরে যাচ্ছিল তখন ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গট্ সমস্ত চার্চে চার্চে prayer করার জন্য নির্দেশ দিলেন—তখন চারিদিকে prayer সুরু হয়ে গেল—বিরাট British empire জুড়ে প্রতিটি মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই প্রার্থনা সুরু করল—আমি তখন সিউড়ী আশ্রমে, আমাদের আশ্রমেও একটি চিঠি এসেছিল prayer করার জন্য। তো দেখ ওই সমস্ত প্রজাকুলের প্রার্থনার ফলে যুদ্ধের গতি কেমন ভাবে পালটে গেল, চারিদিক থেকে জার্মানীরা হারতে সুরু করল। আর হিটলারের যতই সমর প্রস্তুতি, যুদ্ধ কৌশল ও বুদ্ধি থাকুক কেন উনি তো প্রার্থনা করতেন না—নিজেকেই ভগবান মনে করতেন—হের হিটলার—God hitlar নাম নিয়েছিলেন—কিন্তু তার ওই দম্ভভরা চেষ্টা জয়যুক্ত হল না!

তাই বলছি প্রার্থনা রোজ ঠিক সময়ে করে যাবে। প্রার্থনাই হচ্ছে ভক্ত ভগবানের মাঝে মিলন সেতু। মর্ত্য অমর্ত্যের মাঝে যোগসূত্র। কি সাধু, কি গৃহী, প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করবে। ইহপরকালের সব কল্যাণ তিনিই বিধান করবেন। তিনি যে করুণাঘন মূর্ত বিগ্রহ।

কথাগুলি বলতে বলতে শ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি করুণায় ঝলমল করে উঠল। চোখের কোণায় প্রেমাশ্রু টলমল করে উঠল।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পূজা করে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণের পর পাঠ করলেন শ্রীঠাকুর নিজে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকেই মা বলে ডাকা হচ্ছে, মা বড় ভালবাসার জিনিষ কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি ভালবাসা আর বিশ্বাস চিত্ত ওতপ্রোত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা 'সুধাহ্রদ', কি না অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না—অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়—তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে অমৃত বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না, অমর হয়।

শ্রীঠাকুর—(হরিশ কাকার প্রতি) হরিশ, 'সুখে তিষ্ঠতি চমচবা' হয়ে বসে আছ যে, বল - বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে কি হয়? কথামৃত পাঠ মধুপুর আশ্রমে নিত্য করতো?

শ্রীঠাকুরের কথায় সকলে সজোরে হাসলেন—শ্রীঠাকুর চিরদিনই হরিশ কাকার সঙ্গে রঙ্গ কৌতুকচ্ছলে কথা বলে থাকেন

হরিশ কাকা—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর মধুপুর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ রোজ করি। না ঠাকুর বেশী ঈশ্বর চিন্তা

করলে কি মাথা খারাপ হয়—ঈশ্বরকে মানুষ বেশীক্ষণ চিন্তা করতে পারে না বা চায় না—সেজন্য মনে করে মাথা খারাপ হয়ে যায়—ঠাকুর আপনি বলুন আমি তো হুঁশ থাকি আপনার কথা শুনতে পাই না—

শ্রীঠাকুর—ঈশ্বর হচ্ছেন সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর—কাজেই তাঁকে ডাকলে কি আর কেউ বেহেড অর্থাৎ পাগল হয় ? তবে হঠাৎ কিছু করতে নাই তন্ত্র সাধনায় যেমন এক রাত্রে সিদ্ধিলাভের পথ যদি কেউ নিতে যায় তাহলে বিপদ হতে পারে—সেক্ষেত্রে অনেক সময় বিভীষিকা দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়—আবার মা নানা সিদ্ধাই দিয়ে ভুলিয়েও দেন কিন্তু ঠিক ঠিক যোগা গুরু যদি লাভ হয় তাহলে তন্ত্র সাধনাতেও বিশেষ ভয় থাকেনা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক তপস্যা হোমাদি ইহলোকেও ফলপ্রসূ নয়—পরলোকেও ফলদায়ক নয়।

তবে কথা হচ্ছে কি জানো—slow but steady—লেগে থাকবে কিন্তু হঠাৎ কিছু করতে নাই—গীতামুখে ভগবান বলেছেন, 'শনৈ শনৈরুপরমেদ' ধীরে ধীরে মনকে নিরুদ্ধ করে যোগ সাধনা করতে হয়—মনটাকে ধীরে ধীরে ঈশ্বর চিন্তার জন্য প্রস্তুত করতে হয়—তবে মন তৈরী হয়ে গেলে—ঈশ্বর চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না—blotting paper-এ করে কালি তুলে নিতে গেলে কোণা দিয়ে ধীরে ধীরে soak করতে হয় কিন্তু যদি কালির ওপর সমস্ত blotingটি রাখ তাহলে জেবড়ে যায়—তেমনি হঠাৎ যদি চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বর চিন্তা আরম্ভ কর তাহলে—মাথা গোলমাল না হোক খুব reaction হতে পারে। কয়েকদিন বাদে হয়ত হয়ত আর ঠাকুরকে ডাকতে ইচ্ছাই করবেনা। আর গীতা মুখে ভগবান আসুরী তপস্যা পূজা, উপবাস-উপাসনা, যজ্ঞাদির নিন্দা করেছেন। অহঙ্কার দম্ভ ও কামনা বাসনাদি চরিতার্থ জন্যে রাজস তপস্যার ফল ও ক্ষণস্থায়ী—মুক্তিলাভ, ঈশ্বরলাভ কিছুই হয় না। তাছাড়া শরীরকে অত্যধিক কষ্ট দিয়ে পরের অমঙ্গল সাধন জন্য মারণ উচাটন ইত্যাদি জন্য বা অত্যধিক ঈশ্বর উপাসনা সেগুলিও গীতামুখে তামস তপস্যা বলে নিন্দিত হয়েছে। আর অশ্রদ্ধাযুক্ত পূজাদি সম্বন্ধে বলেছেন গীতায়—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ॥

এখন বুঝলে অশ্রদ্ধাযুক্ত তামসিক বা অত্যধিক সকাম ও দম্ভযুক্ত রাজস তপস্যায় যে ঈশ্বর আরাধনা এটি বেশী হলে ক্ষতি আছে কিন্তু নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরে ভালবাসা নিয়ে খুব বেশী করে ঈশ্বরকে ডাকলে অমঙ্গল কেন হবে ? বেহেড কেন হবে ? তিনি যে করুণাময়।

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধোদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

কাজেই বুঝলে অত্যধিক বিষয় সঙ্গ থেকে কামনা—কামনা চরিতার্থ পথে বিঘ্ন হলে ক্রোধ—ক্রোধ অত্যধিক হলে মোহ জন্মে—মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ আর তার থেকেই প্রণাশ ঘটে—স্মৃতিভ্রংশ মানেই পাগল—সেজন্যে অত্যধিক কামনা, বাসনা, বিষয় সঙ্গ এগুলিকে গৃহীরা পর্য্যন্ত avoid করবে।

বরং ঠিক ধর্ম্ম আচরণে প্রত্যবায় নাই—ক্ষতি নাই—কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন প্রত্যবায়োন বিদ্যতে—কাজেই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কত সুন্দর কথা বললেন বলতো ?

গৃহী ও ত্যাগী সন্তানেরা অবাক বিস্ময়ে শ্রীঠাকুরের কথা শুনতে লাগলেন।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নারায়ণ

যোগদাপুরী

সোনার দিনের কাঁপিটি সহসা ভেসে ওঠে মনের মুকুরে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নারায়ণ ভক্তের প্রার্থনায় বুত হয়ে বলেন,—"তোমরা আশ্রম কর আমি যেতে রাজী আছি।" এই কথাটীর ভিতর ছিলো বিরাট শক্তির খেলা ও আকর্ষণ।

বর্দ্ধিষ্ণু বাতিকার গ্রামটীতে প্রায় সকলেই হলেন ভক্ত আর জমিদার বাড়ীর ও অনেকে হলেন দরাজী। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বিবিদিষানন্দ মহারাজের আর সুধানন্দ মহারাজের চেষ্টায় বাতিকারে ঠাকুরের প্রথম শাখা আশ্রম সুরু হোল, একে একে জমা হোল তাঁর লীলা পার্ষদগণ, সত্যানন্দ ভগবানের বহু ভক্ত সঙ্গে সত্যানন্দ ভগবানের দেবমূর্ত্তি দর্শন করতে দলে দলে লোক জমা হয়। কত পুণ্য লীলা-খেলায় কেটে যায় দিন, এই আনন্দযজ্ঞে পূজনীয় জ্যাঠামশায়, ফটিকদা, ভালো মা, সেজকা, ছোটকা কাশীপুর বাড়ীর সকলেই হন আনন্দিত।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নারায়ণ এইখানেই পেলেন তাঁর দ্বাদশ কন্যাদের আসার ইঙ্গিত, তাদের প্রগতির পথ।

বাতিকারে আমছায়া ভরা মাঠ থেকে ভেসে আসে সরষে ফুলের সুরভি। এমনি এক রঙ্গীন বেলায় ঠাকুর তাঁর ছোট ছোট কন্যাদের বলেন "তোরা ভগবানের পূজা আরতি করতে পারবি?" ছোটরা সঙ্গ মধুপ দলের মত এক সঙ্গেই হাঁ দিল, ঠাকুর বল্লেন, "আচ্ছা জয়পত্র হোক প্রথম কে আরতি করবে" সকলেই তো খুব ঠাকুরকে ডাকতে সুরু করেছে, এমন সময় দেখা গেলো অর্চ্চনাদিরই প্রথম আরতি জয়পত্রে হাঁ উঠেছে, সেদিন থেকে দ্বাদশ কন্যাদের মধ্যে প্রথম সুরু হোল ভগবানের পূজা আরতি। বৈদিক যুগের গার্গী মৈত্রীদের মত এযুগেও মায়েদের দিলেন উচ্চ আসন।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নারায়ণের দু একটী কথা এখানে হবে লিপিবদ্ধ। ভোরের গগনে সোনালী মেঘের লুটোপুটী, ঠাকুরকে ঘিরে সকলেই উপরের ঘরটীতে ধ্যানে নিবিষ্ট, বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর ঠাকুর ধ্যানের আসনের পর অর্চ্চনাদিকে বলেন, "তুমি আজ আগুনের ধারে যাবেনা" আর সতী মাকে বারণ করলেন, "মন্টুকে নিয়ে আজ মাঠে ঘাটে বেরোবেনা।"

ছোটদের দল বেশীর ভাগ রান্না ঘরের চালাটীতে পৌষলার মত রান্না ক'রে এনে ঠাকুরকে দেখায়। সেদিন সকালে নূতন ধানের গন্ধে গন্ধে ছোটদের পৌবলাটী বেশ জমে উঠেছে, লক্ষ্মীদি, মিনিদি, আরতিদি, সুমনাদি, মহামায়াদি প্রভৃতিদের। অর্চ্চনাদিও খুব উৎসুক হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে রান্না, এমন সময় চিনিদি বলে উঠলো, অর্চ্চনা তুই ভাই এই হাতায় তেলটা একটু গরম করে দে। চার পাঁচটা বড় উনানে কড়াই হাতা চাপানো হয়েছে। চিনিদি কড়াইয়ে তেল দিয়ে আলু কষি ছেলে দিয়েছে, এমন সময় সেই তেল অর্চ্চনাদির হাতে ছিটকে পড়েছে। অর্পনামা মা, বেলামা এঁরা ভয় পেলেন, ব্যস্ত হয়ে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে অর্চ্চনাদির হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন, ততক্ষণ ফোস্কাও পড়ে গেছে আর মনেও পড়েছে ঠাকুরের কথা—আজ উনুনের ধারে যাসনা, ভয়ে তো অর্চ্চনাদি আর নীচে নামে না, এদিকে আনন্দদাও দিলেন শুভ সংবাদ, ঠাকুর বলেছেন—আজই তোমরা দিউড়ী চলে যাও কেন ঠাকুরের কথা শোনা হয়নি। মধ্যাহ্নে প্রসাদের সময় অর্চ্চনাদি ভয়ে ভয়ে এসেছে। ঠাকুর দেখতে পেয়ে বললেন, এই যে চাঁদ আমার, সাময়িক ভুলটীর জন্যে আর কিছু না বলে দিলেন হাত ভরে প্রসাদ।

শাঁঝ আকাশে জ্বলে উঠেছে হাজার তারার প্রদীপ। ঠাকুর ফিরছেন কীর্ত্তনানন্দে মাঠ ঘাট পার হয়ে যমুনা থেকে। পল্লীগ্রামের আঁধার রাত্তির পথ। তখন বিজলী আলো নেই সেই সীমানায়, মাঝে মাঝে লোকেরা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাসাক আলো। ছেলেরা, মায়েরা দেবতার সুখ সঙ্গলাভে উচ্ছল, এমন সময় একটা কলরব উঠলো। দু তিনজন ছুটে এসে দেখে একটা মাঠের আল ডেঙ্গাতে গিয়ে প্রথমে পুষ্পমা তারপর সতীমা মন্টুকে কোলে নিয়ে একেবারে ছিটকে পড়েছে। বাবা (সুধানন্দ মহারাজ) জ্যাঠামশায় ও ছেলেরা প্রভৃতি ছোট ছেলে মন্টুকে কোলে নিল, তার তখনও ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে বিভোর। সতীমার মনে পড়লো ঠাকুরের বাণী, আজ মাঠে ঘাটে মন্টুকে নিয়ে কোথাও যেওনা, কিন্তু এমন দেবতার আকর্ষণ যমুনা পথে নামকীর্ত্তনে যাবার সময় ছেলের সাবধানের কথাও ভুল হয়ে গিয়েছিলো।

যোগক্ষেম বহনকারী তাঁর আশ্রিতদের নেন ভার। দোতলার ঘরটিতে কখনও বসে ভক্ত ভগবানের বৈঠকখানা। আমরা তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ। কখনও ধ্রুবীদির (উদ্বোধনা পুরী) হাতধরে বলতেন, তুই সাধু হবি, আমাকে আদর করে বলতেন,—তুই এবার আমার কাছে থাকবি তো? ঠাকুর ও মহাপুরুষদের অভিনয় করবার জন্যে থিয়েটারের বালক বালিকাদের ও ভক্ত সাধুদের হতো খাবার ব্যবস্থা তার মাঝে আরাধনা দি, মন্টু, গদাই, শ্যামলকে আমাদের কি-চাকরগুলি যেন দেখাশোনা করে, সে ব্যবস্থাও হতো। একদিন গভীর রাত্রিতে ঠাকুরের ঘর থেকে ভেসে আসছে অর্চ্চনাদির একের পর এক ভাগবৎ সঙ্গীত। ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটি ভক্তও ধ্যানমগ্ন। চারিদিকে ভক্তের মেলা, আমি তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, ঘুম এসেছে ঠাকুরের ঘরের সামনেই ঘুমিয়ে পড়েছি, ঠাকুর বাইরে এসে দেখতে পেয়ে নরম হাতদুটী দিয়ে ধরে ঠিক যায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিতেন। অমলদা, বিমলদা, গদাই, শ্যামলকে স্নেহ আদরে ভরিয়ে তুলতেন। একদিন শ্যামলের কাছে একটা চাবির গোছা দেখতে পেয়ে রঙ্গ করে বাবাকে বললেন,—এটি তোমার কর্ত্তা বাবা।

ধরাধামে তাঁর স্থূলদেহ অবসানের পরও তাঁর কৃপার বাতাস দিয়ে সকলকে করে তোলেন সঞ্জীবিত। আর কুশলরূপের দর্শন দিয়ে বলেন,-এই তো আমি আছি। এগিয়ে এল সত্যানন্দ ভগবানের পঁচাত্তর বছরের শুভজন্ম জয়ন্তী উৎসব। মানিক জ্যাঠা ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের আন্তরিক চেষ্টায় আশ্রমে আশ্রমে রাজকীয় সম্ভারে উৎসবের আয়োজন হলো, আমরা চলেছি তাঁর সন্তানসম বরানগর দুবরাজপুরের পর বাতিকার আশ্রমে জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে। দূর থেকে ভেসে আসছে সানাই, আকাশে বাতাসে একটা শুভ সঙ্কেত ধ্বনী। আমাদের গাড়ী ভগবতীতলা, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, সিংহপাড়া অতিক্রম করে ঘোষপাড়ার লক্ষ্মী জনার্দ্দন মন্দির পার হয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলো। একদিন এই দিকে বিভিন্ন রকমের সুসজ্জিত তোরণ পার হয়ে কুসুমকীর্ণ পথ বেয়ে নবীন গোরা রায় ঠাকুর এসেছিলেন কীর্ত্তনানন্দে। আজ তাঁর অভয় মূর্ত্তি বুকে নিয়ে আমরা আশ্রমে ঢুকলাম। পাখীদের মিষ্ট কলধ্বনির মাঝে ছোট বোন অনামা শঙ্খধ্বনি করে মালা পরিয়ে আমাদের সকলকে জানালো শুভ অভিনন্দন। গুরু ভাই-ভগ্নীদের নিয়ে আনন্দের কোলাকুলি, এদিকে পিছন থেকে গদাই,শ্যামল,অমলদা, পশুপতিবাবু প্রভৃতি হেসে উঠলো, আমরাও প্রথমে চমকে যাই অনামা, অপিতামার কোলকাতা থেকে হঠাৎ এসে শঙ্খধ্বনি করা দেখে। বেশ খানিকক্ষণ হাসির পর বাবাকে শম্ভু মহারাজ ও সুনীলদা বলে,- এটা আমাদের নিজের যায়গা, সুমনাদি, সুষমাদিও বল্লো, ঠাকুরের লীলাপীঠ তো। বাবা বল্লেন,- দাদা (বিবিদিষানন্দ মহারাজ) তোমার যেখানে সুবিধা এই ক'দিন আসন পেতে থাকো, তিনি বললেন,- সবই তো তাঁরই। এই বলে চৈতন্যকে দিয়ে একটি বড়ের আসন তৈরী করিয়ে বসলেন, আবার একটা হাসির কলরব হোল, কিছু প্রসাদ পাওয়ার পর সুমনাদি ও গদাই যমুনায় গেলেন। কিছুক্ষন পর মহামায়াদি ও অন্যেরাও বল্লো,—চল, যমুনা থেকে বেড়িয়ে আসি শ্যামল বল্লো ঐদিকে তো মেলার জন্য যাত্রার মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। তাহোক মঞ্চ, বলে এগিয়ে গেলাম আমরা তপনের সঙ্গে। বিরাট প্রাঙ্গণ থেকে মাইকে ভেসে আসছে ভগবান সত্যানন্দ দেবের জন্মন্তী উৎসব ঘোষণা, সেখানে আশ্রমেরই অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে আমরা যমুনা, ফুল বাড়ী থেকে ফিরে আসছি। বাবা, পশুপতিবাবু, অমলদা, শ্যামল লোকজনদের নিয়ে উৎসবের সুব্যবস্থা করাচ্ছেন।

এগিয়ে এল জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের শুভ দিনটি, ছাত থেকে দাঁড়িয়ে প্রথম প্রণাম করলাম সূর্য রাজকে, শ্যামল বনান্তে ছড়িয়ে পড়েছে তার স্বর্ণ মুকুটের কিরণ। মাইকে বেজে উঠেছে মঙ্গল শঙ্খ, সানাই গান। ঘোষপাড়া ও সিংহপাড়ার ভক্তেরা, ঠাকুরদাসেরা, সন্ন্যাসীরা ফুলে মালায় ঠাকুরের কুশলমূর্তি সাজিয়ে শোভাযাত্রা সুরু করলো আশ্রম থেকে। সিউড়ী দুবরাজপুর বিভিন্ন স্থান থেকে একের পর এক গাড়ী এসে ভিড় জমালো। মাননীয় ননীগোপালবাবু আশ্রমের মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে ধন্য হোলেন, সানাই ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপের মাঝে কীর্ত্তনের সঙ্গে শোভাযাত্রা ফিরে এল, সুমনাদির পূজা ও আমাদের পূজা হোম চণ্ডী-গীতাপাঠের সঙ্গে অন্নদা, নির্ম্মলের গান অপূর্ব্ব আনন্দ দান করলো। বহুভক্ত মধ্যাহ্নে অন্নপ্রসাদ পেলো প্রায় বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত। ভূপেনকা হিরন্ময় ডাঃ পতিত পাবন, দুর্গা প্রভৃতিরা সুষ্ঠুভাবে উৎসবটি দেখে আনন্দিত হোলেন, ছয়দিন উৎসবের পর পৌষ সংক্রান্তির দিনে গ্রামবাসী কীর্ত্তন করে যমুনায় স্নান করলো। আমরা সরযে ফুল দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করে পবিত্র বারি স্পর্শ করলাম তাঁর পুণ্যলীলা স্মরণ করে বলি,—

জয়তু সত্যানন্দ ভগবান।

গোপাল সোনা

স্বামী অখণ্ডানন্দ

(২)

আলোর দুয়ার যদি একবার খোলে, অমৃত সাগরের সুধা এক ফোঁটা যদি মেলে, পরশমণির পরশ পরশে যদি বুকের কোনায় সোনা ফলে, তবেই তো আনন্দের অক্ষয় আধারে মন হয় নিত্য বিভোর! ভক্তের মানসলোকে জাগে জ্যোতিঃ সমুদ্রে লীলার তরঙ্গ। সে দেখে গোপাল সোনার মধুর মাধুরী, ভুলেও ভোলা যায় না যে রূপের মোহন মোহ। স্বপ্ন জাগরণ সব একাকার হয়ে যায় তার চোখে। কদম্ব রোমাঞ্চিত কণ্ঠে করে গানের রেণু :

"সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সখি
আজও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলি মনে
সেই আলোর দুলাল শ্যামলের শ্যাম ছবি
আজও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলি মনে ॥"···(১)

বৃন্দাবনের গোপাল কত রূপে আসেন, লীলা করে যান মানুষের তনু ধরে। ভক্তের মরমী প্রাণ শুধু দেখে আর বিভোর হয়। চন্দ্রাদেবীর বুকে এলেন গদাধর রূপ নিয়ে—যশোদা দুলাল হলেন চন্দ্রাদুলাল। সেই একই নূপুর বাজলো আবার। মুখরিত হ'ল মানিকরাজার আমের বন। ধনী ক্ষেতী চাঁদুর লীলায় নোতুন বৃন্দাবন হ'ল কামারপুরের রাজবন। গদাধর গোপালের লীলা উছলে ওঠে অমর সংগীতে :

"খঞ্জন নট ভঙ্গিম চাল নাচত গোপাল রে
রুনুঝুনু রুনু চরণ বাজত নূপুর মধু রসাল রে ॥
চুম্বন চারু মুদিত অধর সুভগ তিলক ভাল সুন্দর
বিন্দু বিন্দু স্বেদ নন্দিত চন্দন কলিত গাল রে ॥
ডোলে লটপট মকর কুণ্ডল রবিছবি তনু অতি ঝলমল
কঙ্কন কনকনিয়া সব গোপিয়াঁ দেয়ত তাল রে ॥
নবনীত প্রিয় ললিত আনন নেহারি চন্দ্রা অতি উমান
অঞ্চল ঝাড়ি চন্দ্র বদন ধরত নবনী থাল রে ॥
···(২)

সময়ের স্রোত নিরন্তর বিলীন মহাকাল সমুদ্রে। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে চিরন্তন লীলার বীচিমালা। রূপ থেকে অরূপ, অরূপ থেকে রূপ, নব-নব রূপায়নে। চন্দ্রাদুলাল হলেন কালীবরীলাল। চললো মধুর লীলা পৃথিবীর বুকে। ছোট্ট ব্রত, ঠাকুমার আদরের ধন। পরিজন সবাই জানেন—উনি গোপাল সাক্ষাৎ। কিন্তু এত অভিমান কেন ছেলের! কথায় কথায় অত রাগ কেন? আদর ক'রে ঠাকুমা ডাকেন রাগ-রঞ্জন নামে। এ তো রাগ নয়, এ যে সেই অনুরাগ যার ডোরে বাঁধা পড়েছিলেন বৃন্দাবন-বিহারিণী শ্রীমতী আর গোপ-গোপীকুল। এই তো সেই রাগরঞ্জন যার গানে মুখর মরমীর অন্তর :

আরে গোপাল রাগরঞ্জন গোপাল
গাও বধৈয়া দে কর মিঠা মিঠা তাল ঃ
স্বপ্নীলে দিন স্বপ্নীলি রাত
হৈসে মিলে সোনো সুরব ঔর চাঁদ
যব মৈয়াকে দিলমে হঁসে প্যারা দুলাল।
কোই তিলক করে কোমল সা মুখ
কোই ফুলসে সজারে আনোখা রূপ
কোই কুমকুম সে চুমে গুলাবী গাল ঃ
সারী দুনিয়া বনে বৃজকে কুঞ্জন
মন মনমে চমকে রূপকে কুন্দন
উড়ে আসমান জহানমে প্রীতকা গুলাল ঃ—(৩)

কিন্তু ধরায় এসেও ধরা দিতে নেই—এই তো লীলার

চাতুরী ! আর মানুষেরও আছে তাঁকে চিনেও না চেনার, জেনেও না জানার, বুঝেও না বোঝার ভান। একটা মিষ্টি আড়াল, একটা মিষ্টিক ভেইল, লীলার মাধুর্যকে আরও মধুময় করে তোলার ছল। গোপাল কখনো রাজা, কখনো পূজারী, কখনো বা সন্ন্যাসী বৈরিকমণ্ডিত।

গোপাল সন্ন্যাসী ! সব কল্পনার ঊর্দ্ধের কথা। হাঁ, এও সত্য, চাক্ষুষ সত্য। সেদিন ছিল আমাদের ঠাকুরেরই সন্ন্যাসের দিন। ছোট্ট গোপাল বিগ্রহটিকে সাজাতে বসেছেন মায়েরা। বিশেষ দিনে একটু বিশেষ সাজ পোষাক তো চাইই তার। গোপালময়ী জননীর মনের সাধ নানা আভরণে রাজ বেশে সাজাবেন গোপাল সোনাকে। সে যে কত আদরের ধন প্রাণের নিধি কলিজার টুকরো। আর এক গোপাল-সাধিকা গোপালের মাসী। তাঁর মনে হয়— গোপাল আজ বৈরিক ধারে সন্ন্যাসী সাজুক। বলেন— "ঠাকুর আর গোপাল তো এক, আর আজ ঠাকুরের সন্ন্যাসের দিন, গোপালকে মিঁচে একটা গেরুয়া কৌপিন পরিয়ে দাও, আর কিছু পরাতে হবে না।"— এই নিয়ে বাঁশীর সঙ্গে মাসীর একটু না-হাঁয়ার কাটাকাটিও হ'ল ঠাকুরের সামনেই। রঙ্গময় দেবতা দেখছেন শুধু আর হাসছেন মনে মনে। গোপালকে কৌপিন পরিয়ে রাখা সয়না মায়ের মনে। গোপাল বসেছেন সেজে পূজার সিংহাসনে। মন্দিরের দরজা খুলে ঠাকুর বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়, যেখানে ঠাকুরের ছেলেরা সব বসে রয়েছেন। কোনও উন্নত সন্ন্যাসী তখনও ছিলেন ধ্যানময়। উঠে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ কিছু পেলে ধ্যানে ?" আনন্দ-বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠে আসে উত্তর—"হাঁ ঠাকুর, গোপালজী হঠাৎ এলেন ধ্যানে, কিন্তু দেখলাম গোপালজী আজ গেরুয়া বেশ পরেছেন। গেরুয়া পাগড়ী ধুতি পাঞ্জাবী একেবারে সন্ন্যাসীর মত।" অবাক্ কাণ্ড নয় কি। ভেতরের কলহ তো এঁর জানা নেই। গোপাল আজ সন্ন্যাসী সাজবেন, না রাজবেশ পরবেন, সে জন্য তিনি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করলেন ভক্তের মানসলোকে আবির্ভূত হ'য়ে। এ কার কৃপা - গোপালের না ঠাকুরের ? কৃপাধন্য ঐ সন্ন্যাসীকে সিল্কের গেরুয়া কিনে আনতে আদেশ করলেন ঠাকুর। তখনই তৈরী হ'ল গোপালের সুন্দর পোষাক। সন্ন্যাসী গোপালের অপরূপ সাজ দেখে পুলকিত হলেন ভক্তদল। আর ঠাকুরের তো কথাই নাই লীলার আনন্দে হাসির ফোয়ারা ভোরের আলোর মতই ছড়িয়ে পড়ে সারা আকাশ জুড়ে।

কৃপার শেষ নেই কতভাবে কত কৌশলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অস্তিত্বের কথা। ভক্তই জানেন কৃপাময়ের কৃপা কি বস্তু। ঠাকুর আর গোপাল, গোপাল আর ঠাকুর। ভক্তের বিপদে আপদে তিনিই তো রক্ষা করছেন সতত সজাগ প্রহরীর মত, সন্তান-শিয়রে চির জাগরূক জননীর মত। আসানসোলে থাকেন ঠাকুরের এক দীক্ষিতা কন্যা অন্নপূর্ণা সরকার। একবার তাঁর স্বামীর খুব অসুখ হয়েছে। হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক। সংকটজনক অবস্থা। বাড়িতে তখন আর কোনও লোক নেই। পাশের বাড়ীর কাউকে পাঠিয়েছেন মেয়ে-জামাইকে খবর দিতে, ডাক্তার নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে। ঠাকুর আর গোপালজীকে স্মরণ করে প্রার্থনারত মনে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলেই দেখেন পিওন এসেছে চিঠি নিয়ে। চিঠি খুলে দেখেন সেটা ঠাকুরের আশীর্বাদী চিঠি এবং তাতে রয়েছে পুষ্প আর বিভূতি। ভরসা পেলেন মনে, বুঝলেন এ যাত্রা ঠাকুর রক্ষা করলেন। সত্যিই বিপদ কেটে গেল। মনে মনে গোপালের কাছে মানত করেছেন। সেটা দিয়ে এলেন সিউড়ীতে। কিছু নগদ টাকা দিয়ে বললেন গোপালের গয়না গড়িয়ে দিতে। তাই দিয়ে গড়ানো হ'ল গোপালের নবরত্নের হার আর মুকুট। খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু বরচে কুলোয়নি। ঐ টাকায় একটু কম পড়েছে। ঠাকুর মায়েদের বললেন, 'আমি তবে লিখে দিই অন্নপূর্ণাকে বেটা কম পড়েছে পাঠিয়ে দেবে।' মায়েরা বললেন, 'না ঠাকুর, আপনি কেন লিখবেন, ও আর আপনাকে লিখতে হবে না। যাঁর গয়না তাঁর যদি ইচ্ছা হয় গিয়ে চেয়ে আসুন।' ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে এসে মানিক-জ্যাঠাকে বললেন গয়নার কথা এবং একটা পত্র লিখে জানাতে বললেন যে, এতটা কম পড়েছে।—ওদিকে সকাল বেলায় অন্নপূর্ণা মা পূজোয় বসেছেন। ধ্যান একটু গভীর

হয়েছে আর ফুটে উঠেছে একরাশ আলো। সে আলোর মুকুটপথে এসে দাঁড়িয়েছেন গোপাল! নবরত্নের হার মুকুটে কি সুন্দর দেখাচ্ছে গোপালকে। কিন্তু কি বলছেন গোপাল? বলছেন একটু লাজুক মিষ্টি ভঙ্গিতে 'তোমার দেওয়া নেকলেস হার পরেছি, দেখ কেমন সুন্দর হয়েছে! কিন্তু টাকায় কুলোয়নি, আরো কিছু লেগেছে।' ধ্যানের আলো সরে যেতেই ভাবেন—এ কি দেখলাম! স্বামীকে বললেন। কিন্তু তিনি 'ও তোমার মাথার খেয়াল' বলে উড়িয়ে দিলেন। সেই দিনই এসে পৌঁছাল মাণিকজ্যাঠার চিঠি—'টাকায় কুলোয়নি, একটু কম পড়েছে, সুবিধামত পাঠিয়ে দিও।' মনে তখন আনন্দের দোলা। এতো মাথার খেয়াল নয়, এ যে নির্ভেজাল সত্য! লীলাময়ের কৃপার কণায় ভক্ত পায় অমৃতের স্বাদ। চিঠি লিখে তাঁরা জানান ঠাকুরকে তাঁদের অন্তরের প্রণাম। ঐ লীলা নিয়ে ঠাকুর লিখলেন একটি কবিতা :

"এদিকে ভক্ত নিখর ধ্যানের দুয়ার সহসা খুলে
চেয়ে দেখে একি গোপালিয়া বুকে আভরণ এক দুলে।
ভোরের দেউল আলো করে রাজে নবরত্নের হার
মৃদু স্বরে কহিল দেবতা সেজেছি দেখোনা আর।
'লেগেছে কিন্তু আরো কিছু জেনো' চমকিয়া ওঠে প্রাণ
এতকি ভাগ্য সত্যই তুমি এসেছ কি ভগবান!
তারপর হায় অবিশ্বাসের চাওয়া চাই কিছু চিন্
সত্যই এল সংবাদ পরে তিল নহে তার ভিন্।
লীলা যে নিত্য হরিও নিত্য আমরাই শুধু হারি
অবিশ্বাসের বিষ জর্জর বোঝা যে বিষম ভারি।"....(৪)

এই অবিশ্বাসের বোঝা বয়ে জীবের প্রাণান্ত। সে কষ্ট কিছু লাঘব করতেই তো তাঁর আসা। অরূপ, রূপ ধরে ধরা দেন বহুভাবে। অহেতুক কৃপার পরশে অবিশ্বাসের বিষ, বিশ্বাসের সুধা হ'য়ে ঝরে ভক্তের বুকে।

গোপাল চিন্ময় অনন্ত চৈতন্যময় জ্যোতির্ময় জীবন্ত। ঐ বিগ্রহের ভেতরে চেয়ে দেখ! তার চোখেমুখে যেন কত কথা। সে যেন উৎসুক তার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে অনেক গল্পের মণিমানিক ছড়িয়ে দিতে। সে এসেছিল ঠাকুর সত্যানন্দের জন্মের কিছু আগে। বুঝেই এসেছিল তার দোসর আসছে মর্ত্যলোকে অমরার সুরভি ছড়াতে। তাই তার লীলাচপল মৃণালবাহুর আলিঙ্গনে বেঁধেছিল তাঁকে। কত আদর করেছিল, কত আদর পেয়েছিল! প্রথমে তো এত সব ব্যবস্থা হয়নি! তখন ঠাকুরের শুধু তপস্যা আর তপস্যা। তারপর মায়েরা এসেছেন তখনও মন উধাও অরূপ রাজ্যে। বিরামহীন ধ্যান সাধনা সমাধি। একি ভাল লাগে বেশী দিন। তাই তো নামান্ ছলনার অবতারণায় লীলার মাধুর্য্য বেড়েই চলে দিন দিন।

সেদিন রাত্রে শয়ন দেওয়া হয়েছে ভোগ নিবেদনের পর। মশারীও খাটিয়ে দিয়েছেন মায়েরা। গভীর রাত্রি। প্রায় তিনটার কাছাকাছি বাজতে চলেছে ঘড়িতে। ঠাকুর নিজের আসনেই ক্ষণিক বিশ্রামে মায়ের কোলে অর্দ্ধতন্দ্রিত। হঠাৎ অনুভব করেন কে যেন পায়ে নাড়া দিচ্ছে জোরে জোরে। চোখ খুলে দেখেন কেউ নেই আবার কিছুক্ষণ পরে আরও জোরে নাড়া দিচ্ছে ছোট্ট মুঠিতে পায়ের গোছ ধরে। ঠাকুর উঠে গিয়ে তুড়ি দিয়ে মায়েদের তুললেন। বললেন, 'আলো নিয়ে আয়, গোপালের মশারীতে ভাল করে দেখ্ তো কিছু আছে নাকি।' মায়েরা বিস্মিত চোখে দেখেন, গোপালের মশারীর ভেতর একটা খুব বড় পতঙ্গ ঢুকেছে। পতঙ্গ মশারীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চলে বেড়াচ্ছে আর গোপাল ভীত চোখে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। আর তাই সে ঠেলে তুলেছে ঠাকুরকে। তাড়াতাড়ি পতঙ্গটি বের করে দেওয়া হ'ল। তারপর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে মায়েরা গোপালের মশারীর নীচে চারপাশে ইলাষ্টিক লাগিয়ে দিলেন। তারফলে রূপোর খাটে মশারীর চারপাশ এঁটে থাকে। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান ছোট্ট গোপাল।....

কিন্তু তারপরই একদিন ঘটলো আর এক অঘটন। গোপালকে রোজ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে তোলেন মায়েরা ঠাকুর ভোর চারটা থেকে বারান্দায় বসতেন ধ্যান করতে ছোট্ট মশারী খাটানো আসনে। আশ্রমে তখন তপস্যার কঠোরতা ছিল খুবই বেশী। গরমের দিনেও পাখা নিতেন না ঠাকুর কোনও দিন। কোনও ভক্ত জোর করে ধ্যান লাগালেন ঘরে। ঠাকুর সেটা চালাতে দিতেন না। যদি

কখনও ফ্যান চালানো হ'ল তো একটু পরেই অফ্ করিয়ে দিতেন। মায়েদেরও ছিল সেই একই কঠোরতা। ঠাকুর বাইরে বললে ঘরের ফ্যান সঙ্গে সঙ্গে অফ্ করে দিতেন তাঁরা। হলঘরে ফ্যান ছিল কিন্তু চালাতেন না। তো সেদিন ভোর পাঁচটায় গোপালকে শয়ন থেকে তুলতে গিয়ে মায়েরা দেখেন গোপালের বিছানা বালিশ জামাকাপড় সব সপসপে ভিজে, গোপালের সারা গায়ে শিশির বিন্দুর মত চকচকে জলের ফোঁটা। প্রথমেই মনে হয়েছে নিশ্চয়ই রাত্রে বেড়ালে কিছু কাণ্ড করেছে, নইলে এত জল আসবে কোথা থেকে ঐ ছাদে! ভয়ে ভয়ে ঠাকুরকে ডেকে এনেছেন ধ্যান থেকে তুলে। ঠাকুর দেখেই মায়েদের বলেন শুঁকে দেখতে। মায়েরা গোপালকে তুলে শুঁকে দেখলেন—কই! খারাপ কিছু তো নয়! এ যে অপূর্ব সুরভি! ঠিক ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের সুবাসের মতই মিষ্ট টাটকা ফুলের সুবাস। ঠাকুরকে বলাতে ঠাকুর বলেন, "তাহ'লে খারাপ কিছু নয়। মনে হচ্ছে গোপালজী ঘেমেছেন। তবু আমি পূজোর সময় মা'র কাছে একবার দেখবো।"—পূজোর সময় মায়ের কাছে জানলেন ঠাকুর গোপালের খুব গরম করেছে রাত্রে, তাই অত ঘেমেছেন। নির্দেশ দিলেন মায়েদের সারারাত পালা করে গোপালকে হাতপাখা দিয়ে বীজন করতে। সে আদেশ আজও পালন করছেন আশ্রমের মায়েরা। আর হাতপাখার সেবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছেলের শিয়রে জেগে থাকেন তাঁরা। ঠাকুরও ঘেমে যেতেন একটুমাত্র গরমেই। কষ্ট হ'ত খুবই দেহের জ্বালায়। তবু কেউ রাজি করাতে পারেনি ফ্যান চালানোর জন্য। কিন্তু গোপালের সেটা সইলো না, তাই ছলনা করে করলেন এই সেবার ব্যবস্থা। বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুরের কষ্ট তাঁরই কষ্ট। ঘেমেছেন তিনি কিন্তু সেই স্বেদ মকরন্দে ঠাকুরের অঙ্গ-সুবাস। লীলার এই আস্বাদে ভক্তের স্মৃতি আজও মধুময়।

বৃন্দাবনের বালক কৃষ্ণ। একদিন তিনি বীরদর্পে চলে গেলেন বৃন্দাবন থেকে মথুরা, মথুরা থেকে দ্বারকা। ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি রাজাধিরাজ কৃষ্ণ হ'য়ে পরিচালনা করলেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। আমরা দেখি—তাঁর দুটি রূপ। বিরাট রূপ, ক্ষুদ্র রূপ। বিরাট রূপে জগতের আশ্রয়দাতা মহা-রাজাধিরাজ। ক্ষুদ্ররূপে কোনও মাতৃক্রোড়ে আশ্রয়প্রার্থী ছোট্ট শিশু, ভীত সন্ত্রস্ত সচকিত, বাৎসল্যের ক্ষুধায় চির অতৃপ্ত।

সেদিন ভারতের স্বাধীনতা দিবস পনেরই আগষ্ট। ঠাকুর পতাকা উত্তোলন করলেন আশ্রমে। তারপর বিশ্ব নির্ঘোষে গগন কম্পিত করে কামান দাগলেন। উড়ে গেল একঝাঁক শ্বেত কপোত শান্তির বার্তাবহ। কিন্তু মায়েদের কোলে বসে থাকা ছোট্ট গোপাল সেই শব্দে আর কামানের হাওয়ার ভয়ে জড়োসড়ো। কোল-কুঁকুড়ি হ'য়ে ঢুকে গেছে মায়েদের বুকে। আর মায়েরা স্পষ্ট অনুভব করেছেন গোপালের বুক দুই দুই করছে। লোকে বলে লাভ রাখো যদুবীর, আর কামানের শব্দ শুনে যদুবীরেরই এই অবস্থা।

অবশ্য ভয় পাওয়া তার নোতুন নয়। হাজার হোক্ ছোট্ট ছেলেই তো। একবার হয়েছে কি, এক ভক্ত তাঁর মৃত আত্মীয়ের আত্মার শান্তির জন্য পূজো দেবেন বলে ভোগ এনেছেন আর গোপালজীর জন্যও আলাদা করে ভোগ এনেছেন। গোপালের ভোগ সাজাতে গিয়ে ভুল করে সেই মৃত আত্মার ভোগটি গোপালের কাছে ধরে দিয়েছেন কেউ। ভোগ দিতে গিয়ে মায়েরা দেখেন গোপাল বড় বড় চোখ করে চেয়ে আছেন, যেন কি দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছেন। ভোগ হচ্ছে না, বারে বারে সেই একই দৃশ্য চোখে ভাসছে ভোগ দিতে গিয়ে। ঠাকুরকে জানালেন মায়েরা। ঠাকুর দেখে বলেন, মনে হচ্ছে কোনও প্রেতাত্মা এগিয়ে আসছে ভোগের দিকে। তাই গোপাল ভয় পাচ্ছেন। ব্যাপার কি।

অন্য কারও ভোগ কি রয়েছে ওখানে? তখন খোঁজ নিয়ে জানা গেল ভোগ বদলের কথা। সেই প্রেতাত্মাটি বসে আছেন তাঁর জন্য আনা ভোগটির ওপর দৃষ্টি দিয়ে। এই শিশুবৎ ভয় আছে বলেই তো জীবন্ত শিশু ঐ গোপাল মায়েদের অত আদরের ধন। ভাব-রাজ্যের এসব কথা ভাবুক—প্রাণ ছাড়া কেই বা বোঝে। গোপালকে যাঁরা যে ভাবে দেখেন, তিনি তাঁকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করেন তুষ্ট করেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'—(৫)

কিন্তু ভাবে ফাঁকি থাকলেই গোলমাল। যদি শিশু ভাবে দেখছো, তাহলে ঐশ্বর্যবোধ আনা চলবে না। ভক্ত এক গোবিন্দ দাস—কৃষ্ণের গোপাল ভাবের সাধক। গোপাল তাঁকে দর্শন দেন কত লীলা করেন। দরশে পরশে ভরিয়ে রাখেন ভক্তের অন্তর। একদিন রাত্রে একটি বেড়াল ম্যাঁও করে ডেকে উঠেছে জোরে। ভক্তের কাছে শয়নরত গোপাল চমকে উঠেছেন ভয় পেয়ে। ভক্তের মনে আসে দ্বিধা। তাইতো! যিনি বিশ্বের অধীশ্বর ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান, জগতের সুরিচালক, নিয়ন্তা, ঈশ্বর, তিনি একটা বেড়ালের ডাকে এত ভয় পেয়ে গেলেন?—ব্যস্। এই সন্দেহটুকু আসা মাত্র তাঁর দর্শন বন্ধ হ'য়ে গেল সারা জীবনের মত। অবিশ্বাস নয়, শুধু ঐশ্বর্যবোধ; তাতেই ছেলের এত অভিমান। তাই বৃন্দাবনের ভাব বড় কঠিন। সহজপ্রাণা গোপীদের ছিল সিদ্ধেরও সিদ্ধ অবস্থা। তাঁরা ছিলেন এই পঞ্চম পুরুষার্থে স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী।

গোপাল অভিমানী। শিশুর অভিমান আকাশ ছোঁয়া। ভক্তি ভালবাসার কতটা আসল কতটা মেকী, তার মত হিসেব আর কেউ কি বুঝতে পারে? তার আত্মসম্মানবোধ যে সবার চেয়ে বাড়া! একবার আমাদের আশ্রমের জনৈক মহারাজ নারকেলের নাড়ু ভোগ দিয়ে গেলেন গোপালজীর জন্যে। ভোগের সময় মায়েরা সেটি নিবেদন করতে গিয়েই দেখেন—গোপাল লাথি ছুঁড়ছেন। যতবার ঐটি দিতে যান, গোপাল তাঁর ছোট্ট চরণ ছুঁড়ে সরিয়ে দেন ভোগ। ঠাকুরকে বলা হ'ল। ঠাকুর জানলেন ওটা অন্য কারো নাম করে আনা ডাকলেন সেই সন্ন্যাসীকে। জানা গেল সত্য ঘটনা আর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাজীতে হেরে, তাকে নাড়ু খাওয়াবার জন্য তিনি ঐ নাড়ু করিয়ে এনেছিলেন। তারপরই বুদ্ধি করে এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। গোপাল যে বড় কঠিন ঠাঁই! ধরা পড়ার লজ্জা আর গোপালের লীলার আনন্দ, দুয়ে মিশে মহারাজের অদ্ভুত অবস্থা।

যতই ছোট্ট হোক্‌না কেন, গোপাল সবার চেয়ে বড়। যদি সবার চেয়ে বড় না বল, সে খাবে না, অভিমানে নয়ন পাখী উধাও হবে নীল আকাশে। সেদিন ঠাকুর হঠাৎ মায়েদের জিজ্ঞাসা ক'রে বসেন, "আচ্ছা বলতো, গোপাল বড় না কিশোর গদাধর?" যাঁদের গোপাল ইষ্ট, তাঁরা তো সঙ্গে সঙ্গেই বলেন 'গোপাল বড়'। কিন্তু যাঁর ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্তরের একটা টান ঐ কিশোর গদাধরের ওপর, আর যাঁকে বিশেষ লক্ষ্য করেই ঠাকুরের ঐ প্রশ্ন, তিনি একটু কিন্তুতে পড়ে চুপ করে আছেন। ঠাকুর কিন্তু ছাড়বেন না। আবার বলেন, "বল্ কে বড়? গোপাল না কিশোর? 'দুইই এক' 'দুইই বড়' তা বললে হবে না। পরিষ্কার করে বলতে হবে তোমার কাছে কে বড়?" উত্তর দিলেন তিনি—"কিশোরই বড় আমার কাছে!" ব্যস্, আর কি! একটু পরেই ভোগের সময় ভোগ দিতে গিয়ে দেখেন, গোপাল ভোগ নিচ্ছেন না। কত ভাবে বুঝিয়ে কাকুতি মিনতি করে বলেন, 'খাও গোপাল সোনা, খেয়ে নাও, ছিঃ অমন করতে নেই যখন তখন, খেয়ে নাও দেখি চাঁদ আমার হীরের টুকরো আমার।' কিন্তু না আজ তিনি খাবেন না যতই সাধাসাধি করনা কেন। ভীষণ অভিমান হয়েছে তাঁর। শেষে ঠাকুরকে বলতেই হ'ল। ঠাকুর তখন হাসছেন মনে মনে। একটু চেয়ে দেখলেন গোপালের মুখে। তাকে বড় বলা হয়নি কেন?···তাই তো! সে যে সবার বড় সবার বাড়া। তখন কি আর করবেন। শত আদরে বুকে চেপে ধরে চুমু খেয়ে মা বলেন, গোপাল বড় গোপাল বড় গোপাল বড়। মান ভাঙে গোপালের। হেসে ওঠে কচি সোনা। তখনই লিখলেন গান আর এক গোপাল। সে গান তাঁর বাঁশীর কণ্ঠে ফুটে উঠলো সুর হয়ে:

"অভিমানে কিরে কি যায়
কালো দুটী নয়ন পাখী····
কে বলেনি আদর করে
বড় করা সবার চেয়ে
বুকে চেপে রাখতে নারি
মান করা রাঙ্গ গোপাল বাসী।" (৬)

আর এক ভক্ত কবির উপলব্ধি ফুটে উঠেছিল এমনি এক নিবেদনের গানে:

"যো হম ভলে বুরে তৌ তেরে
তুমহেঁ হমারী লাজ বড়াই বিনতী সুনু প্রভু মেরে।

সব ত্যজি তুব সরণাগত আরো নিজ কর চরণ পরে যে
তুব প্রতাপ-বল বলত না কাহু, নিজ ভরে ঘর চেরে।
ঐব দেব সব রহ ভিখারী, তুমহরী কৃপাতেঁ পারে সুখ
যু অনেরে।" (৭)

আমরাও কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরই চরণে শরণাগতি জানাই—যিনি ছোট্ট হয়েও সবার চেয়ে বড়, যাঁর সামনে 'ঐব দেব সব রহ ভিখারী', যিনি নিজমুখে প্রতিশ্রুতি দিলেন—

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥'(৮),

যাঁর কৃপাতে অপাবৃত সত্যের মুখ, আর যাঁর কৃপাতে ভক্তের বুকে বয়ে চলে নিরন্তর আনন্দের ফল্গুধারা। বল তাই গোপাল সোনার জয় জয়, বল সত্যানন্দ-গোপালের জয় জয়।

---

(১) গান : শ্রীদিলীপ কুমার রায়
(২) গান : শ্রীঅর্চনাপুরী মা
(৩) গান : শ্রীঅর্চনাপুরী মা
(৪) কবিতা—'আরো কিছু লাগলো' : শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব
(৫) গীতা ৪।১১
(৬) গান : শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব
(৭) গান : সুরদাস (৮) গীতা ১৮।৬৬

প্রতীক্ষা

ঃ সত্যশীল চৈতন্য

নিঝুম নিস্তব্ধ এক রাত্রি ——,
আমি জেগে আছি।
প্রতীক্ষার প্রতীক্ষায়
চলে যায় এক একটি
প্রহর। ব্যাকুলতা আসে
নাড়া দিয়ে যায়,—
প্রতীক্ষিত চিত্ত হয়ে ওঠে
উদ্বেলিত——।
কই সে এলো না।
কতকগুলো হতাশা,
আর তার সাথে
একমুঠো বেদনা,
বুকটাকে মুচড়িয়ে দেয়।
সে কি আসবে না।
যদি আসে——
আবার যদি ডাকে——
ভেঙ্গে পড়া চেতনাকে
তুলে ধরি।
আবার প্রতীক্ষা।
রাত্রির শেষ। পেচক ঘোষণা করে
তার কর্কশ ধ্বনির মাঝে
যেন কতকগুলি বিষতীর,
যার প্রতিটি, দেয় তীব্র জ্বালা
আর পারি না——,
ভেঙ্গে যায় আশার বাঁধা বুক,
বলি, কই তুমি কই চিত্ত চোর,
এখনো প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
কতো যাবে এ সুদীর্ঘ
রজনী মোর।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

শ্রীশরণাপুরী

কে বলে এসেছে ফাল্গুন
কোথা চিহ্ন তার ?
উত্তর পশ্চিম কোণে
ঘন আমগাছটার আড়ালে বসে
সেই যে পাপিয়াটা ডাকত
সারাটি রাত্রি ধরে
পিউ কাঁহা
পিউ কাঁহা বলে
তবে সে আর ডাকে না কেন ?
কে বলে এসেছে ফাল্গুন,
কোথা চিহ্ন তার ?
মন্দির পরাঙ্গে হেলান দেওয়া
ঐ লতাটার বুকে
গুচ্ছ গুচ্ছ মধুমালতিরা
তাকে দেখবার জন্য
মলয় হিল্লোলে বার বার উঁকি দিত
একটি মধুর ভঙ্গীতে
কখন বা
টুপটাপ করে একটি দুটি করে ঝরে পড়ত···
প্রণাম করার ছলে
আজ কোথায় তাদের সেই গৌরব নম্রতা ?
কে বলে এসেছে কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার রাত
কোথায় চিহ্ন তার ?
পলাশ পাতার ঢাকা
সেই মিষ্টি অন্ধকার রাতখানার বুকে
এক ফালি চাঁদের সেই
প্রেমল মধুর
একটুখানি চাওয়া
তবে কেন আজ ব্যাহত—
কেন আজ উদাসীন ম্লান ?
কে বলে এসেছে কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার রাত.
কোথায় চিহ্ন তার ?
তাই যদি হবে তবে কেন নেই
সে রাতের অতিথীকে আহ্বান করতে
শত শত পায়ের চঞ্চলতা
বক্ষের উদ্বেলতা
নেই বরণডালা সাজাবার আনন্দ গুঞ্জরণ—
নেই পূজার থালায় স্তবকিত ফুলের সুরভী ও সীধু ?
কে বলে এসেছে জন্মদিন
কোথায় চিহ্ন তার
জন্মদিন তো নিয়ে আসে আগমন বার্তা
কিন্তু আমাদের পরস্পরের চোখের আয়নায়
কোথায় তার প্রতিবিম্ব ?
সেখানে তো শুধু চাপা কান্নার ব্যথা,
হারিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ বিলাপ
জীবনের ভার বহনের অক্ষমতার প্রকাশ
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীসত্যানন্দ মহোৎসব

স্বামী বীরানন্দ

(২)

মহিলা সম্মেলন : সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : শোভাযাত্রা

দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এবার শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের জন্মজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এই আনন্দমুখর গৌরবময় উৎসবের আংশিক সংবাদ আমরা ভাবমুখের গত মাঘ '৮৩ সংখ্যায় পরিবেশন করেছি এবং সেখানে উৎসবের স্মরণীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সাধুসম্মেলন ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলনের কথাও বলেছি। এখন উৎসবের অন্যান্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানগুলির কথায় আসছি। তবে তার আগে পাঠককে এই অবসরে গত সংখ্যায় উৎসব সংবাদের একটি মুদ্রাকরপ্রমাদ বিষয়ে একটু অবহিত করে নিতে চাই। গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলনের সংবাদে শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক মহাশয় তাঁর ভাষণে কবিসুন্দর কুনুদরঞ্জনের যে কবিতাটি উল্লেখ ও পাঠ করেন সেটির নাম ঐ সংখ্যার (মাঘ '৮৩) ৩৬৪ ও ৩৬৫ পৃষ্ঠায় দুটো জায়গাতেই "গ্রামীণ" ছাপা হয়েছে। হবে "গ্রামণী"। এই অনিচ্ছাকৃত মুদ্রাকরপ্রমাদের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত।

এবার শুনুন দুবরাজপুরে আনন্দঘন যুগপুরুষ সত্যানন্দদেবের জন্মমহোৎসবের বাকী অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ। প্রথমেই বলবো মহিলা সম্মেলনের কথা।

মহিলা সম্মেলন :

মহিলা সম্মেলন বসলো ১২শে ডিসেম্বর, অপরাহ্নে। ঠাকুর সত্যানন্দদেব ও তাঁর সঙ্গীত কাব্য শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীঅর্চনা মায়ের মনোজ্ঞ ভাষণ এবং দাইধিরা গার্ল স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মায়া ঘোষের পরিচালনায় দাইধিরা ও সিউড়ীর আর. টি. এবং মিউনিসিপাল গার্ল স্কুলের ছাত্রীদের মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান এবারের মহিলা সম্মেলনকে খুবই আকর্ষণীয় ক'রে তোলে।

শ্রীঅর্চনা মা ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রোচ্চারণ করে ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানিয়ে বলেন, আজ আমরা ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেবের ৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহিলা সম্মেলনে যোগদান করেছি। দুবরাজপুরে মহিলা সম্মেলনের এটা দ্বিতীয় বর্ষ। প্রথম বর্ষের মহিলা সম্মেলনের ঐতিহ্য পূর্ণ দিক ছিল "নারীবর্ষ"। এবছরের গৌরবময় দিক হচ্ছে এটা ঠাকুরের ৭০তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ। আমাদের ঠাকুর ছিলেন একাধারে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তবে আমরা তাঁর যে প্রতিভাচিতে প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলাম সেটা তাঁর শিল্প, সঙ্গীত ও কবি প্রতিভা। তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেটা তাঁর দার্শনিক সত্তাকে চিনবার বা তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তাকে জানবার বয়স ছিল না। আমরা চিনেছিলাম তাঁর শিল্পকে এবং কবিতাকে। তিনি আমাদের মানুষ করেছিলেন এই শিল্প কাব্য এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন শুষ্ক কঠোর জীবন নয়। সেখানে তপস্যার সঙ্গে ছিল আনন্দ রস। বলা যেতে পারে এটাই আমাদের ঠাকুরের এ-যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমাদের আশ্রমে এই মহিলা সম্মেলন প্রথম হয়েছিল সারদা মার শতবার্ষিকী উপলক্ষে সিউড়ীতে। মনে আছে, ঠাকুর তখন অলক্ষ্যে থেকে সেই সভা পরিচালিত করেছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, আজও তিনি

অলক্ষ্য থেকে তাঁর কন্যাদের এই সম্মেলন আনন্দিত নেত্রে দর্শন করছেন আর আনন্দে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন। সে মহিলা সম্মেলন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়বস্তুতে ভরা। এবারের সম্মেলনেও শিল্প সঙ্গীত ইত্যাদি নানা ধরণের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনন্দ দানের আয়োজন করেছেন শ্রদ্ধেয়া মায়াদি। তাঁর প্রচেষ্টায় সিউড়ী ও দাইহিয়ার তিনটী স্কুলের ছাত্রীদের আমরা পেয়েছি। তারা তাদের কৃতিত্ব নিবেদন করবে ঠাকুরের কাছে। সবার মধ্যেই ভগবান আছেন। সুতরাং আমার মনে হয় সকলকে আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে তারা ভগবানকেও আনন্দ দান করবে। আমাদের ঠাকুর বলেছিলেন, আমি থাকব না কিন্তু আমার গান থাকবে। কাজেই তাঁর সঙ্গীতের মাঝেই তাঁকে আমরা খুঁজে পাব। তাঁর স্থূল দেহ হয়তো চোখের আড়ালে চলে গেছে কিন্তু তাঁর সঙ্গীত আছে, কাব্য সাহিত্য শিল্প আছে। সেগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে পাবো। সেগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে বরণ করে নেব। তাঁর সঙ্গীত, সাহিত্য, কবিতা, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদির মধ্যে আমরা তাঁর আনন্দ সত্তাকে উপলব্ধি করবো। তিনি আমাদের প্রেরণা দিন। তাঁরই একটি কবিতা আমি পাঠ ক'রবো। কবিতাটির অর্থ হচ্ছে আজকের এই হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ জগতে যার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমের একান্ত অভাবে আজ জগতের এই দৈন্য এই দুর্দশা। তিনি যে আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে শিল্পকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন তার কারণ হ'ল যে, মানুষের মনে আধ্যাত্মিক রসের সঙ্গে নৈতিক চেতনার সঙ্গে শিল্পটা যদি জড়িয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে তারা একটা রস পাবে, আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে একটা নতুন ধরণের আনন্দ পাবে। সেটা নিরস হয়ে যাবে না অথচ সেই আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে শিল্পটা জড়ানোর ফলে শিল্পটাও একটা নতুন পথ পাবে এবং সেটা দিব্যাতিদিব্য হয়ে উঠবে। দেবতার পূজার, আরাধনার একটা পথ হয়ে যাবে। ঠাকুর সেটাই চেয়েছিলেন। তাই তিনি এত অজস্র সঙ্গীত কবিতা রচনা করে গেছেন। তাঁর মেয়েদের ভেতর যে এত সঙ্গীত, কবিতা, সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তার কারণও হ'ল এই শিল্পবোধটিকে একটি নৈতিক রূপে রূপান্তরিত করা। ঠাকুরের কবিতাটি এবার পাঠ করে শোনাচ্ছি—কবিতাটির নাম "জুডাসের হোক রূপান্তর"—

"স্বর্গচ্যুত হরি চন্দনের মত
ফিরে দাও বসন্তের অকারণ মুহু সমারোহ।

হে ঠাকুর তব আবির্ভাব
পুরানো হবার নয়,
নিত্য সে যে পুণ্য পুরাতন—
নিত্য তুমি সৃষ্টিতে তোমার,
নিত্য তব লীলাঙ্গন ধরণীর
ধাম সমারোহে।
নূপুরিত হালদার তীর
দিক সাড়া আরবার
কীর্তন গরগর দখিন সে পুর—
আবার জাগুক মাঙ্গলিকে ধরে নিতে
সেই নৃত্য গান
আবার দাঁড়াও প্রভু ঊর্ধ্ববাহু
ক্ষমা সুন্দরের রূপে
ভুলে যাই সব দুঃখ মোহমত্ত হিয়া—
ভুলে যাই অশিবের যত কোলাহল।
জিয়াইয়া লও তব সগর সন্তানে
বাহু পশারিয়া লহ 'চাপাল গোপালে'
অমৃতের এক বিন্দু অমর্ত্ত বিলাসে,
'জুডাসে'র হোক রূপান্তর।"

আমরা তাঁর চরণে বারবার তাঁরই কবিতার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাই যে, এই হিংসা দ্বেষ জর্জরিত পৃথিবীতে আবার তুমি এস, আবার তুমি জেগে ওঠো। জুডাসের হোক রূপান্তর—যে জুডাস তোমার আধ্যাত্মিক সত্তাকে তোমার পবিত্র সত্তাকে আঘাতে জর্জরিত করেছে, সেই জুডাসের ধ্বংস নয়, তার রূপান্তর ঘটুক, তোমার প্রেমময় আবির্ভাবে।

শ্রীঅর্চনা মার ভাষণের পর সুরু হয় ছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠান। একটি ছোট মেয়ের কথক নৃত্য, ভানুসিংহের পদাবলীর কয়েকটী দৃশ্যের নৃত্যরূপে শ্রীমতীর অপূর্ব ভাবব্যঞ্জক নৃত্যাভিনয় এবং কতকগুলি রঙিন শাড়ী নিয়ে মেয়েদের

বর্ণালী নৃত্য সত্যি ভোলবার নয়। এবার মহিলা সম্মেলনও হয়েছিল আশাতীত। একটি আসনও খালি ছিল না। বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শককে আনন্দে অভিভূত ক'রে তোলে। পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক মহাশয় অনুষ্ঠান শেষে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মঞ্চে এসে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রীদের সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে বলেন, খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে, আমি বহু অনুষ্ঠান দেখেছি কিন্তু এমন সুন্দর অনুষ্ঠান কখনও দেখিনি। আশা করি একদিন ভবিষ্যতে টেলিভিশনে বাড়ীতে বসেই তোমাদের এই চমৎকার অনুষ্ঠান দেখে বহুলোক আনন্দ পাবে।

সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

উৎসবের অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আঞ্চলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোকোর্ত্তন, রামায়ণ গান, শিশু সম্মেলন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বাউল গান, বাঁকুড়ার দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের বাউল গান, কবিগান, বিখ্যাত কীর্তনীয়া কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন, স্থানীয় "শিল্পী মহলের" যাত্রানুষ্ঠান ও প্রখ্যাত শিল্পী সমাবেশে সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখ।

বিভিন্ন দিনের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে সিউড়ীর শিবাজী পাল, খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীঅশুমান রায়, শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী শ্রীপ্রবীর মজুমদার, শ্রীমতী চিত্রা মজুমদার ও সারন্তনী মজুমদার প্রভৃতির সত্যানন্দ সঙ্গীত, শ্রীদীপক মুখার্জীর রবীন্দ্র সঙ্গীত, জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীপিন্টু ভট্টাচার্য ও বনশ্রী সেনগুপ্তার ভজন ও ভক্তিগীতি এবং প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও তাঁর দলের বাউল গান শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দান করে। গানের অনুষ্ঠানগুলিতে তবলা সঙ্গত করেছেন শ্রঃ গদাধর চৈতন্য, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, চঞ্চল ঘাঁ প্রভৃতি শিল্পীগণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এবারের উৎসবে গানের আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে স্বামী অমলানন্দ মহারাজ ও শ্রীপ্রবীর মজুমদারের অবদান অনস্বীকার্য।

শোভাযাত্রা :

উৎসবসূচীর শেষ দিনে সুন্দর শোভাযাত্রা নগরবাসীর মনে একটা সোনালি আনন্দের দাগ রেখে যায়। আশ্রমের বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ থেকে সুরু হ'ল শোভাযাত্রা। গজেন্দ্র গমনে চলেছে একটী হাতি—তার পেছনে N.C. C ও স্কাউটের দল এবং পরপর গৈরিক পতাকাবাহী ছেলেমেয়েদের দল। দলগুলি সুন্দর করে সাজানো। লালপাড়ের শাড়ী পরা ৭৫টী মেয়ের হাতে মঙ্গলঘট। লালস্কার্ট পরা ৭৫টি মেয়ের হাতে গৈরিক পতাকা। নিজের নিজের স্কুলের সবুজ নীল পোষাকে পতাকাবাহী ছাত্রবাহিনী। দলগুলোর মাঝে মাঝে কোথাও শানাই, কোথাও ব্যাণ্ড পার্টি, কোনো ট্রাকে বাউল দল, কোন ট্রাকে শ্রীপ্রবীর-চিত্রা-সারন্তনী মজুমদার প্রভৃতি কলকাতার গায়েরে শিল্পীর দল, কোনটিতে মুখোসধারীর কীর্তন দল, কোনটিতে কীর্তন রত আশ্রমিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর দল। নাম গান, বাউল আর কীর্তন দলের ট্রাকগুলির একেকটিতে আমাদের ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদা মা, জিনয়নী মা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের বড় বড় প্রতিকৃতি সুন্দর করে ফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের মূর্তি ছিল দুটো—শ্রীহস্তে গোলাপ ফুল নিয়ে বিরাট দাঁড়ানো মূর্তি একটি, আর একটি, আসনে বসে শিবহাস্যে অভেদ কুশল জিজ্ঞাসারত ভঙ্গিতে 'কুশল তো ?' মূর্তি। নামগান আর সত্যানন্দের জয়ধ্বনিতে দুবরাজপুরের আকাশ বাতাস মুখর ক'রে এগিয়ে চলেছে নয়নাভিরাম শোভাযাত্রা। পথের দুধারে, বাড়ীর দালানে, অলিন্দে, ছাতে, বাতায়ন পথে কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। নামের টানে গানের সুরে ছুটে এসে ভিড় করেছে এমন-মনোমুগ্ধকর শোভাযাত্রার দর্শন-পিয়াসী অগণিত মানুষ—তারা আনন্দবিহ্বল নেত্রে দুহাত তুলে ঠাকুরকে জানিয়েছে প্রণাম, ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করেছে পুষ্পাঞ্জলি, বাতাসা আর বাদামের

দিয়েছে হরির লুট। কোথাও বা ঠাকুরের ট্রাক থামিয়ে ভক্ত মায়েরা প্রদীপশিখা জেলে আরতির থালা হাতে ট্রাকে উঠে ঠাকুরকে করে গেছে আরতি। শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া বাদুড়-ঝোলা যাত্রীভর্তি বাসগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে থমকে। বাসের যাত্রীরাও দিয়েছে জয়ধ্বনি, প্রণাম করেছে ঠাকুরকে। অপূর্ব শোভাযাত্রা তাদের প্রাণেও জাগিয়েছে আনন্দের উদ্দীপন। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে তারা স্পর্শ করেছে ট্রাকের সাধুদের। ট্রাক থেকে সাধুরা ছুড়িয়ে পাওয়া হরির লুটের বাতাসা ছুঁড়ে দিয়েছেন বাসের মধ্যে। বাসের ভেতরে পড়ে গেছে কাড়াকাড়ি। দেখতে দেখতে দুবরাজপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গর্বে গর্বিত পাহাড়েশ্বরের সানুদেশে এসে পড়ল শোভাযাত্রা। পিচঢালা চড়াই উতরাই পথের দুধারে অবাধ উন্মুক্ত প্রান্তর। তারি মাঝে এখানে ওখানে সারিবদ্ধ ঊর্ধবাহু তালগাছে ঘেরা বড় বড় পুকুর। দূর দিগন্তে মিশে রয়েছে সবুজ বনানী। ওপরে নীলঢালা উদার আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে মুঠো মুঠো সোনা সোনা রোদ। এমনিতর অপূর্ব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত পটভূমির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রার উড্ডীয়মান শত শত গৈরিক পতাকার স্রোত। এই ত্যাগরঞ্জিত গৈরিক শোভাযাত্রা যেন অধ্যাত্মজগতে ধর্মান্দোলনের শান্তিবাহিনী—সত্য আর আনন্দের গান গেয়ে ভরিয়ে তুলেছে বিশ্বভুবন। এবার কেল্লার পালা। শোভাযাত্রা তাই পথের পাশে পাহাড়ের কোল থেকে বিস্তৃত বিশাল প্রান্তরে নেমে গোলাকার হয়ে মোড় নিচ্ছে আশ্রম অভিমুখে—কী অপূর্ব দৃশ্য! বিরাট শোভাযাত্রার শেষ আর সুরু দুটো প্রান্তই এখন সকলের দৃষ্টিগোচরে। বৃত্তাকার শোভাযাত্রাকে মনে হচ্ছে যেন নানা রঙিন ফুলে গাঁথা একটী বিরাট মালা—শোভা পাচ্ছে ঠাকুরের কণ্ঠে। শোভন-সুন্দর শোভাযাত্রার এ অপরূপ রূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এ শুধু দুচোখ ভরে দেখার আর আনন্দে অন্তর ভ'রে নেবার। প্রায় তিন ঘণ্টা দুবরাজপুরের পথে পথে সত্যানন্দের জয় গান গেয়ে হাজার হাজার মানুষের বুকে আনন্দমধুর এক অক্ষয় স্মৃতির রেখা এঁকে দিয়ে শোভাযাত্রা ফিরে এলো আশ্রম অঙ্গনে।

শোভাযাত্রা শেষ হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য! এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে নামগানে মত্ত থেকে দীর্ঘ পথশ্রমেও কারও চোখেমুখে এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই। হঠাৎ দেখছি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর দল, বাতিকারের ঠাকুরদাসদের দল, কীর্তনীয়া বাউলের দল, বালক বৃদ্ধ বহু ভক্তের দল ঠাকুরের মন্দিরের বিরাট বারান্দায় এসে ঈশ্বরীয় আনন্দে মশগুল হয়ে উদ্দাম নামনৃত্য করছে। নামের টানে নামী নেমে আসেন। নামীর স্পর্শে এক দিব্যাতিদিব্য আনন্দে পাগল হয়েছে সবাই। বেদছন্দায় ঠাকুর যে বলেছেন, "ঈশ্বরের আনন্দ সর্বোত্তম—ঐ সুখই সবচেয়ে বড়"—এটাই বিশেষভাবে অনুভব করলাম। প্রেমময় দেবতার প্রেমের পরশ লেগেছে সবার মনে—তাই সত্যানন্দ নামে আত্মহারা হয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে করছে এমন উদ্দাম নৃত্য। নাম শেষে আমাদের ঠাকুরের জয়, মায়ের জয়, গোপালের জয়, গুরু ভগবানের জয়, ভক্তবৃন্দের জয়-এর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো দুবরাজপুরের দিকদেশ।

এদিন মধ্যাহ্নে আর এক আনন্দদায়ক দৃশ্যের অবতারণা হ'ল যখন আশ্রম আঙ্গনে সুরু হল হাজার হাজার দরিদ্রনারায়ণদের পরম তৃপ্তির সঙ্গে খিচুড়ী প্রসাদ পাবার মহাপর্ব। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। দুবরাজপুর আশ্রমে এ-দৃশ্য দেখে পরম আনন্দ পেতেন দীনের ঠাকুর সত্যানন্দদেব। এদিনের দীন নারায়ণদের প্রসাদ পাওয়ার দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে বুঝি বসেছে অন্নকূটের উৎসব। সত্যানন্দ অন্নপূর্ণার অবারিত দুয়ার আজ সবার জন্য খোলা। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে এসেছে সেই পেয়েছে প্রসাদ।

দুবরাজপুর ঠাকুরের যে কত প্রিয় ছিল এবারকার সত্যানন্দ উৎসবই সে কথা প্রমাণ করলো। তাঁর সূক্ষ্ম আবির্ভাবের পরশ মাখা হয়েছিল আশ্রমের ধূলি-বাতাস সবকিছু। বর্ষিত হয়েছে ঠাকুরের কৃপা অজস্র ধারায়—আশ্রমের ওপর, শীর্ষ সেবক স্বামী ভূপানন্দের ওপর, দুবরাজপুরবাসী সকলের ওপর। নইলে এমন সুন্দর উৎসব সম্ভব হতো না, এমন একপ্রাণ এক সুর একতার ভাব জাগতো না। ঠাকুরের অশেষ কৃপা, সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দজীর

নিরলস উৎসাহদান ও নীরবসেবক স্বামী ভূপানন্দজীর উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার আকুল আগ্রহে সকলকে উদার আহ্বান জানানোর ফলেই "আমার উৎসব" মনে করে ছুটে এসেছেন সবাই। ছুটে এসেছেন প্রাণপণ সহযোগিতা করতে অন্যান্য আশ্রম থেকে স্বামী অমলানন্দ, স্বামী গৌরানন্দ, স্বামী রামানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী মহানন্দ, ব্রহ্মচারী শরণচৈতন্য প্রভৃতি সাধু ব্রহ্মচারীরা। এসেছেন বার্মাশেলের শ্রীশিবনাথ নন্দী, বরানগরের শ্রীমান কিশোর রায় ও লোকনাথ পাল আর সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাসের পঁচাশিজন স্বেচ্ছাসেবকের দল। এঁদের দিনরাত এক করে অতিথি অভ্যাগতদের সেবাপরিচর্যার কথা ভোলবার নয়। শ্রীমঙ্গলাল দাশগুপ্ত ও শ্রীকল্যাণ ঘোষ এমন সুন্দর একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ক'রে নিজেদের পরিচালন দক্ষতারই দিয়েছেন প্রমাণ। মহিলা সম্মেলন ও শোভাযাত্রার অপূর্ব সাফল্যও যে স্বামী সুরেশ্বরানন্দ মহারাজের সংগঠন নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক সে কথা না বললেও চলে। সত্যেন মহারাজ, দশরথ ভাই, ভগীরথ ভাই, বিনয়বাবু আর নিমাইবাবুর কথা কি আর বলবো—এতো তাঁদের ছিল মহাব্রত।

সত্যানন্দ নামের জয়ধ্বনিতে, সত্যানন্দ নামের কল্যাণ স্পন্দনে প্রেমের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল যুবরাজপুরের আবহাওয়া মণ্ডল। মন বলে, এ স্পন্দন নির্বাধ হোক—ছড়িয়ে পড়ুক সারা জগতে—এ স্পন্দন চিরন্তন হোক। গুনগুনিয়ে ওঠে অন্তরে শ্রীঅর্চনা মার গানের কলি—"তোমার নামের জয়ধ্বনি/সকাল সাঁঝে উঠুক রণি/স্বর্গমর্ত্য মাঝে রচুক/একটি প্রেমের যোগ।"

শরৎচন্দ্রকে

হেমকুমার মুখোপাধ্যায়

যুগলালিত সংস্কারের কৃত্রিম রাজপথে নয়
সহজ সুন্দর জীবনের সোজাপথ ধরে
তুমি হেঁটে গেছ দীর্ঘ পারে
কাঁটার মুকুট পরে
নিন্দার ক্রশ কাঁধে বয়ে—নির্বিকার
যেন এমনি করেই হেঁটে যেতে হয় সত্যের পথে।
কারণ তুমি জানতে—
চাঁদে কলঙ্ক থাকে এবং
সূর্যালোক ঢাকা পড়ে মেঘে
আর তাই
শতাব্দীর ব্যবধানেও
হৃদয়ের পাঁচ রঙে আঁকা তোমার ছবিগুলিতে
খুঁজে পাই—
শরতের শিশির মাখা শিউলির পবিত্রতা।

হরিণ শিশু

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধন চক্ষে চায় ভাষাহীন হরিণ-শাবক,
বার বার ধ্যান ভাঙে সান্ধ্যছায়ে—ভরত মুনির ;
রাজ-ঋষি ভাবে মনে, কবে এক নির্জন প্রভাতে
সরস্বতী নদীতীরে এই শিশু নির্ঝরে
বুকে তার এসেছিল, ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে শিশু
জীবনেরে জড়ায়েছে ওতপ্রোত শত পাকে পাকে।
হোমানল নিভে যায়, যজ্ঞ বন্ধ সমিধ অভাবে।
ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি, তপস্যাই নিত্য পণ্ডশ্রম।
মোক্ষকামী ঋষিরাজ পৃথিবীকে ছেড়ে অবশেষে,
নতুন পৃথিবী এক গড়ে তোলে আশ্রমের কোণে,
কিন্তু মমতায় মাখা এ পৃথিবী ভেঙে যাবে হায়
এ শাবক চলে গেলে দূর বনে বয়সের ডাকে।
জলভরা তুমখানি পড়ে রবে অনাদৃত হয়ে,
জিনদূর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রবে যোগভ্রষ্ট ঋষি।

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ প্রাণতোষ ঘোষাল বসু
(অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

রোগ-শোক-জরা ব্যতীত যে ভয়টি আমাদের নিয়ত পীড়িত করিতেছে, তাহা হইতেছে মৃত্যু বিভীষিকা, যাহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হয়, কারণ এই পরিবর্তনশীল জগতে মৃত্যু একটি নিশ্চিততম পরিণতি যাহা হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। কালের এই অমোঘ বিধান হইতে রাজাস্তঃপুরে প্রতিপালিত গৌতমও নিজেকে ব্যতিক্রম বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। এই অবাঞ্ছিত অতিথিটির অঘোষিত আবির্ভাবে, যে কোনও মুহূর্তে, যে কোনও সোনার সংসার ছত্রভঙ্গ হইতে পারে, যে কোনও ব্যক্তিকেই আনন্দমেলা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইতে পারে।

সুতরাং রোগ-শোক-জরার ন্যায় সাময়িক দুঃখ শুধু নহে, মৃত্যুর ন্যায় চরম বিনাশ এবং বেদনাদায়ক দৈহিক বিকার হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও উপায় আছে কিনা, ইহা মানুষের আদিম এবং চিরন্তন জিজ্ঞাসা; এবং বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে। শুধু মৃত্যু নহে জন্মও মানুষের অপর একটি অনিবার্য দুঃখের উৎস। এবিষয়ে কোনও মতভেদ নাই যে মাতৃজঠরে ভ্রূণের সুদীর্ঘ অবস্থিতি নীরন্ধ্র গহ্বরে কারাবাসের সমতুল এবং তারপর আছে নির্যাত সঙ্কটের শ্বাসরোধকারী বর্ত্মে উত্তরণের পালা। এবং এইরূপ জন্মই হইতেছে সাংসারিক সকল যাতনার হেতু। যদি একবার জাত এবং মৃত হইয়া এই কাহিনী শেষ না হয়, পুনঃপুনঃ এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আমাদের আবর্তিত ও নিষ্পেষিত হইতে হয়, একবার তাহা চিন্তা করিলে মহাপরাক্রান্ত অসুরেরও হৃৎকম্পন হওয়াই স্বাভাবিক। এই পরিণামগুলির নিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা যে ক্ষণিক সুখভোগ হইতে প্রমাদলাভ করি, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের অজ্ঞানতা বা মায়া। কিন্তু প্রত্যেকেরই জীবনে এমন দুর্দিন কোন না কোন সময়ে আসে যখন সকল সমস্যা, বিভীষিকার ন্যায় উদিত হয়। মহাপুরুষগণ জীবনের প্রারম্ভেই সহজাত জ্ঞান বলে এই সকল সমস্যা অবহিত হইয়া তাহার সমাধানের পথ আবিষ্কার করিতে উদ্যোগী হন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নানা ধর্মমতের প্রবর্তন বা ব্যাখ্যা করিয়া যান।

বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের কয়েকটি মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—(ক) সাংসারিক সুখ অনিত্য এবং সেইজন্যই দুঃখের কারণ ?[১] (খ) মানুষকে তাহার শুভাশুভ সকল কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে ![২] (গ) এই সকল কর্মফলে পুনঃপুনঃ নবদেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর দুঃখভোগ করিতে হয়।[৩] (ঘ) মানবজীবনের অপেক্ষা একটি উন্নততর অবস্থা আছে যেটি লাভ করিলে জন্মমৃত্যুর এই চিরন্তন দুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইয়া 'অনাগামী' হইতে পারেন।[৪]

১। সুত্তনিপাত (৪।১,২১৬) : : ছা (১৩।১) 'যো বৈ ভূমা তাল্লে সুখমস্তি', গীতা (৫।২২) 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে····'।

২। সংযুক্তনিকায় (১।৭২, ১।৯৩, ২।১৮৫); দীঘনিকায় (২।১৫-৬), মজ্ঝিমনিকায় (২।৭৪, ৩।১৭৮, ২০৩), অঙ্গুত্তরনিকায়, তিকনিপাত (৫৩); সুত্তনিপাত (২।১৮৭) : : বৃ (৪।৪।৫) -'সাধুকারী সাধুর্ভবতি···পাপেন' (২।২।৭) 'যোনিম্—যথাকর্ম যথাশ্রুতম্; ছা (৫।১০।৭)—'য ইহ···বা'।

৩। ধম্মপদ, জরাবগ্গো; মজ্ঝিমনিকায় (১/৩৮, ৭৩); সংযুক্তনিকায় (২।১৮০-১; ১৮৭,২১৩) : : বৃ (৪।৪।৬) —'প্রাপ্যান্ত·····কর্মণে', (৪।৪।৩৪)—'তদ্ যথা·····ভূতানাম্'; কঠ (১।২।৬) -পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে'। গীতা (৮।১৬, ১৯, ২১, ৯।২০-২১)।

৪। ভদ্দাবগ্গো (১৯); ব্রাহ্মণবগ্গো (১৮) মজ্ঝিমনিকায় (৩) : : কঠ (১।৩।৭-৮)—'যস্ত্ববিজ্ঞানবান্—····ন জায়তে; মুণ্ডক (৩।২।৫-৯)—'সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়া·····অমৃতো ভবতি।'

যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষ যে কেবল অণু বা জীবাণু হইতে যাত্রা করিয়া বহুযুগের বিবর্তের ফলে ভাবৎস্থায়ী সর্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছে তাহা নহে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই বিবর্ত এখনও শেষ হয় নাই, কারণ মানুষ এখনও পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে নাই। মনুষ্য জীবনের উর্দ্ধে, উচ্চতর জীবন আছে ইহা বুদ্ধদেবও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই জীবনলাভ করিবার জন্য তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেখানে ভগবানের স্থান নাই। তাঁহার মতে যে ইন্দ্রিয় সকল দুঃখের কারণ সেই ইন্দ্রিয়গ্রামের সংবরণ এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে সর্বপ্রকার নিবৃত্তিই[৫] উচ্চতমপদ বা নির্বাণ লাভের উপায়। কিন্তু এইরূপ নিরালম্ব আত্মোৎকর্ষের প্রচেষ্টা বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষ ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহা বুদ্ধদেবের অনুগামিগণই সপ্রমাণ করিয়াছেন।[৬] হিন্দুধর্ম সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা সহজতর এবং অধিকতর যুক্তি সম্মত। (ক্রমশঃ)

৫। রাগ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, সর্বপ্রকার পাপকর্ম বর্জন; শম, দম, সত্য, অপ্রমাদ, সহিষ্ণুতার আশ্রয়; পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান (ধম্মপদ—কোধবগ্‌গো; ধম্মট্ঠবগ্‌গো; বালবগ্‌গো, অপ্পমাদবগ্‌গো; ভিক্খুবগ্‌গো; বুদ্ধবগ্‌গো)।

৬। যথা, মহাযান মতে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের করুণা নির্বাণ প্রাপ্তির সহায়ক বলিয়া তাঁহাদের পূজাকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। যদিও বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, স্বানুভববাতীত শিক্ষকের প্রভাবে নির্বাণ লাভ সম্ভব নহে। [(অঙ্গুত্তরনিকায় (১৯৩।২, মজ্ঝিমনিকায় (১৩৪, ২৬৫, ৩১৯); মহাপরিনির্বাণ সুত্ত (২।২৬)]

গান

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃপা দিয়ে প্রভু তোমার পূজার
ভুল করে নাও মোরে।
আমার যা কিছু নিয়ে গেছে সবই
মন-চোর চুরি করে॥
তুমি তো বলেছো—"এ যুগ কৃপার যুগ"
করুণাবতার। দেখাও মোহনরূপ।
কৃপা-বারি দিয়ে ধুয়ে নাও মোরে
রাঙা পায় পড়ি করে॥...
বাসনা আমার আর কিছু নয়—
হতে তব পূজা ফুল—
দয়া করো ওগো দয়াল ঠাকুর
ক্ষমো মোর যত ভুল।.
করো পবিত্র করো গো শান্ত
শুদ্ধ করো হে করুণাকান্ত
প্রেমের ঠাকুর সত্যানন্দ
এসো কাছে চুপিসারে॥....

ও গোপাল

সুধেন্দু মল্লিক

দিন গেল ব্যর্থতায় পরিতপ্ত—এ বড়ো জুলুম
মাঝরাতে কেড়ে নিস ও গোপাল দুচোখের ঘুম।
দিনে তো দেখিনি তোকে কোথা ছিলি বল?
কারা সঙ্গে ছিল তোর একবারো পড়েনি কি মনে
আমি আছি চিরসুহৃৎ? আমারো তো এই ইচ্ছে হয়
এবার আমার ঘরে খেলা হোক অন্তহীন আনন্দ বিস্ময়।
দেখি জল পরিব্যাপ্ত স্থির
অনন্ত আকাশে কোন শব্দ নেই চারিদিক নির্বাক বধির।
কিন্তু যেই ঘুম আসে বিছানায় কি যে ছুটোছুটি
করিস আপন মনে মানিস না কারোর ভ্রুকুটি।
এতো শব্দে এতো গন্ধে ঘুম থাকে? জেগে উঠে দেখি
কেউ তো কোথাও নেই, ছিলো বা আছে কি
এই ঘিঞ্জি ছিঁড়ে যায় সব শান্তি নীরন্ধ্র গভীর অন্ধকারে।
দুবাহুর আর্তনাদে ও গোপাল
দুরন্ত স্বপ্নের শব্দ করাঘাত করে বন্ধদ্বারে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটী ছড়া

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুনা-১৬
৮।১১।৭৬

শ্রীভিখারীশঙ্কর সুচরিতেষু,

আশি বছর বয়স হ'ল, একটু শ্রমেই ক্লান্তি নামে,
তারোপরে বৈদ্য এল, কাটল কতই ডাইনে বামে।
তারোপরে ঘোর হৃদ্রোগ অনেকেই তো ভেবেছিল
শিবের বিষাণ বাজল বুঝি—নামগানও তাঁর পেয়েছিল।
শুনলাম আমি বাঁশি, বিষাণ ভয়ঙ্কর নয়, পুলকে তাই
বেঁধেছিলাম কত যে গান—শুনে খুশী হ'ত সবাই।
এমন দারুণ বিপদেও বাঁশি শোনে, গানও বাঁধে—
ভাবতে হ'ত অবাক—যদিও কেউ কেউ হায় আজো কাঁদে।
আমি বলি হেসে : "আহা, অশ্রু ঝরাও কেন শুনি ?
শয্যাশায়ী গান গাইছে, দাও না সাবাস : 'বা রে গুণী।'"
রূপকথা নয় এ-কাহিনী, তবুও ভয় হয়—কে জানে
গহন প্রাণের কথা কেমন লাগবে যুক্তিবাদীর কানে—
মন যাদের হায় খোঁজে নিতুই অল্প সুখের সুলভ আরাম,
তাঁকে যারা : "মনের গলিই দেয় মিলিয়ে আনন্দধাম।
গোনাগুন্তি মাপা জোপা—এরি মধ্যে পেতে হবে
পরম পাওয়া, বুদ্ধি বিনা কল্পনা পায় দিশা কবে ?"
ভক্ত বলে হেসে : "বুঝুন, প্রজ্ঞা কে পায় কল্পনাতে ?
ছাই দিয়ে কি দেববৃত্তি যায় গড়া রং-জল্পনাতে ?
নাস্তিকের কু-যুক্তি যে চায় ফাঁকি দিয়ে ফাঁক ভরাতে,
দেবতা নয় মনগড়া সান্ত্বনা প্রাণের দোল লীলাতে।
মায়া বলি কুতর্ককেই—মিথ্যাকে যে সিংহাসনে
বসিয়ে ফাঁকা বাক্‌জালকেই নেয় মেনে স্তব-বিজ্ঞাপনে
চিরন্তনকে পাশ কাটিয়ে সোনার হরিণ বরণ ক'রে,
বিলাসপঙ্কে ডুবছে যারা তাদেরি আদর্শ ধ'রে।
কার প্রসাদে শান্তি মেলে, কার প্রেমে চায় তৃপ্তি প্রাণে,
কার সাহসে জাগে অভয়, কার ডাকে ধাই বিজয় বানে,
গভীর ব্যথায় কার চাহনি গোলাপ ফোটায় কাঁটার বুকে?
কার কিরণে নিভে গিয়েও রাঙে রবি যুগে যুগে ?
কোল পেয়ে কার অচিন শিশু হয় উছল আনন্দ গোপাল ?
কার প্রসাদে চোখের ঠুলি খসে, কাটে আঁধার-আড়াল ?
না ভাবলে যা স্বতঃসিদ্ধ, ভাবতে গেলে হয়ই মনে—
যা দেখি তার ভাঙের কি অন্ত আছে এ জীবনে ?
উপর ভাসা দৃষ্টি ছেড়ে হ'তে যে না চায় ডুবারি
পায় কি মণি ? পায় শুধু সে-ই যে অগাধের অভিসারী।

সেই অভিসার দীক্ষা পেতেই পাঠান ঠাকুর এ-সংসারে,
ছোট সুখে মাতাল ক'রে ব্যথিয়ে করেন পার অপারে।
দুঃখে আসে বিদ্রোহ কুটবুদ্ধি মনের ব্যঙ্গ লোকে,
পরে যখন তুফান ঘনায় তখন তিনি সে-দুর্যোগে
বাজান বাঁশি তাঁর ;"মা ভৈঃ ! আমি আছি—জানিস যখন
সেই সুরে আলাপ করলে বরণ, পাবি রে আমার দর্শন,
বাসতে যদি আমায় ভালো শিখিস একটু একটু ক'রে
পরম শরণ পাবিই আমার আবছা চরণচিহ্ন ধ'রে।"
এ নয় ধাঁধা, এই সত্য, যা দেখি না সেই যে চালায়,
ভালোবেসে গোপন থেকে নানা ছলেই ভালোবাসায়।
পিছন থেকে চালায় যে তার ঠেলার খবর কে না রাখে ?
আনন্দময় হবে জীবন চালক যিনি জানলে তাঁকে।

ইতি। ভবদীয় শ্রীদিলীপকুমার রায়

• • •

সুকোমলের একটি মহৎ গুণ আছে, সে সত্যি মানে—
অন্ধকার গহনা নয়, নতিই কেবল আলো আনে।
কিন্তু হ'লে হবে কী হায়, এ-যুগ ঘোর বস্তুবাদী,
যে শুধু শাসায় আর ভোগায়, চায় না তাঁকে পেতে সাধি'
আমরা যখন কায়া ভ্রমে ছায়াই ধরি ভুল সোহাগে,
শ্রদ্ধা বলে,"মায়াকে সে ই দেয় ছুয়ো সে জানে তাঁকে।*
ঠাকুর স্বামীজির তর্পণ সত্যি মধুর লাগল প্রাণে :
যুক্তিনিপুণ হায় মানলেও ভক্তি তাঁকে টেনে আনে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

---

*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীগীতা ৭/১৪

বেদছন্দার ছন্দে

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

ঠাকুর সত্যানন্দের জীবনবেদ বহু শাখায় পল্লবিত। কিন্তু তার প্রত্যেকটিই ভগবৎ উপলব্ধির সুদৃঢ় কাণ্ডে বিধৃত। কর্মবেদ, ধ্যানবেদ, সাধনবেদ, ভক্তিবেদ, শক্তিবেদ, প্রেমবেদ—প্রত্যেকটি চিন্তা ও ভাবনা, অভ্যাস ও অনুশীলন সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত : ভগবানকে ঘিরে সমন্বিত ও মতলাম্বিত।

তাঁর বেদছন্দার কয়েকটি চিন্তা কণিকা নিয়ে তাঁর জীবনদর্শনের একটা দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আজ চেষ্টা করবো।

তাঁর মতে ভগবানই জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য, সার অর্থ ; Highest value —The God. সেই ভগবানকেই উপলব্ধি করতে হলে চাই শিল্পী মন। কারণ এই শিল্পী মনের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে সত্য শিব সুন্দর। এই দৃষ্টিতেই জীবনের সমস্ত নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যের স্থিতি। সত্য শিব ও সুন্দরকে দৃষ্টিপথে রাখতে পারলেই মানবজীবন নীতি ও ধর্মের উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে পারে। গোটা জীবনই একটা শিল্প হয়ে ওঠে সত্য শিব সুন্দরের সাধনায়। সত্যের সাধনা আনন্দেরও সাধনা। তাত্ত্বিকের ও তপস্বীর জ্ঞান ও কর্মযজ্ঞ, প্রেমিকের প্রেমে ও আনন্দে রসময় ও সুন্দর হয়ে ওঠে। রসিকই এই সৃষ্টির আনন্দ লীলায় যোগ দিতে পারে ও শিল্পীমনই রসময়ের পরিচয়ই শুধু নয়, সঙ্গসাত করে সৃষ্টির বৈচিত্র্যে।

শুধু লাফানোয় নৃত্য হয় না, শুধু কাঁদায় কাব্য হয় না। শিল্পসাধনার মূলে আছে একটা সংযম সাধনা, একটা সৃজনশীল লীলানন্দের অনাসক্তি, একটা উদ্বেলময় প্রকাশতন্ত্রী। শুধু ব্যাকুলতার ও বাসনার প্লাবন জীবনকে সৃজনশীল করে না। জীবনে ব্যাকুলতার মোড় ফিরান প্রয়োজন, ঐহিককে ভগবৎ ব্যাকুলতার পথে চালনা করা, দুদিকে সংযমের তীর ঠিক করে সমুদ্র অভিমুখে নদীকে নিয়ে যাওয়ার মত। এই চলন পদ্ধতি হলো নিবেদন যোগ।

সব কর্ম, সব ভাল মন্দ, সব সুখ দুঃখকে ভগবানের পূজার ফুল বলে, তাঁকে নিবেদন করা। এই নিবেদন সাধনায় শক্তি আসে, মুক্তিও আসে। এই নিবেদন তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর শক্তিতে-শক্তিমান হয়ে ফিরে আসে। এটাই শ্রীঅরবিন্দের surrender। এটাই গীতারও বাণী। আবার এই নিবেদনে বন্ধনের সৃষ্টি হয় না—তাই এটা মুক্তির সাধনা। কর্ম, এই নিবেদন সাধনার বাধে না—এটাই হচ্ছে গীতার কর্মের কৌশল।

ঠাকুর বলেন, সুখদুঃখের ব্যবধান কমাতে কমাতে সমীকরণ ঘটে, তখন একটি মাত্র অনুভূতি থাকে - ব্রহ্ম। এই বাড়ানো কমানোর ফলে এমন একটা অবস্থা হবে যে সাধক সুখেদুঃখে সমভাবাপন্ন হয়ে যাবে ; গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া। ব্রহ্ম তখনই প্রকাশিত হবে। অর্জুনামা এক জায়গায় তাই বলছেন, জোয়ার ভাটা থামানোটাই তো সাধনা।

এই সমতাতেই শুদ্ধতা। শুচিতা, সাধনার অঙ্গ। ভগবতমুখী মনই শুদ্ধ মন। এই মনকেই বলে মনের মত মন। এই অনাসক্ত মন, যার আসক্তি শুধু ভগবানে, তৃষায়, তাতে বাসনার ও বিভেদের বিক্ষোভ নেই বদ্ধতা নেই, তাই সে শুদ্ধ। সেখানে একটা শান্ত সুন্দর সঙ্গীতের আনন্দ ঝংকার ও জ্যোতির প্লাবন।

অবশ্য সত্য শিব ও সুন্দরকে দেখতে পেতে হলে চাই ঠাকুরের কৃপা। তাঁর কৃপার স্পর্শেই সত্য শিব সুন্দর প্রকাশিত হয়ে ওঠেন।

এই সাধনার পথে ঠাকুর মানুষের মধ্যে শিল্পীমনকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সকল কর্মই যাতে হয়ে ওঠে অর্চনা ও সাধনা, আরতি ও আরাধনা। নিবেদন যোগে শরণাগতিতে আসে শক্তি ও মুক্তি। কল্যাণকৃতের জীবনে তখন ধ্বনিত হয় নির্বেদের পরমানন্দ। জয় ঠাকুর।"হে যুগ-সম্ভব পুরুষপুরাণ নমো হে নম।"

বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর ১২৪তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি উৎসব

প্রঃ তারক চৈতন্য

গত ১১ই ডিসেম্বর '৭৬, সোমবার, প্রভাতী সুরে মাঙ্গলিক সানাই-এ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ উৎসবের সূচনা। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজার্চনা, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, চণ্ডীপাঠ ও হোমানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নারায়ণ ও লীলানারায়ণ প্রসাদ পেয়ে আনন্দিত হন।

বিকেলে পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ও তাঁর সম্প্রদায় আশ্রমে শুভাগমন করেন। তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নাটমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। একে একে আশ্রমের সাধুরা সকলে সমবেত হলেন। নাটমন্দির আগে থেকেই বেশ পরিপাটী করে সাজিয়ে রেখেছিলেন ব্রহ্মচারী সত্যশরণ চৈতন্য। আমাদের আশ্রমের পরিবেশ শিবানন্দজীর খুব ভাল লাগে। তিনি বলেন বহু জায়গায় গঙ্গাতীরের আশ্রম দেখেছি কিন্তু এখানকার এই দিব্য শান্ত পরিবেশের তুলনা নেই। যেন এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণ বোধ করছি। এমন জানলে আমি নিজেই একটা প্রোগ্রাম করে আজকের এই শুভদিনে বেশী করে আনন্দ উপভোগ করতুম। যাক্ ইচ্ছা রইলো ভবিষ্যতে একবার ভাল করে প্রোগ্রাম করবাব। এই সঙ্গে তিনি আগামী ১লা জানুয়ারী '৭৭ কল্পতরু দিবসে তাঁর আশ্রমের উৎসবে যোগদানের জন্য আমাদের সাধুদের আমন্ত্রণ জানান।

শ্রদ্ধেয় অতিথিকে বরণ করার পর জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য এবার সভার কাজ সুরু হ'ল। স্বামী উমানন্দ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী তারক চৈতন্য শ্রীশ্রীমার বাণী ও জীবনলীলা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। স্বামী মধ্বানন্দ মহারাজ "মায়ের কথা" এবং শ্রীশম্ভুরায় চৌধুরী "যুগে যুগে যার আসা" গ্রন্থ থেকে শ্রীমা সম্বন্ধে অংশ বিশেষ পাঠ করে শোনালেন। এরপর স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাঁর সুললিত কণ্ঠে গঙ্গামাতার বন্দনা করে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র জীবনবেদের ওপর ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার সুরুতেই আকুলভাবে 'মা' 'মা' ডাকেই মাকে পেলেন। মাকে পাওয়ার পর এলেন তাঁকে তন্ত্র-সাধনা শিক্ষা দিতে যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেন, বাবা, তন্ত্র-সাধনার জন্য প্রস্তুত হও। ঠাকুর বল্লেন, দাঁড়াও, আগে মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করি। যাঁর মাকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁর আর তন্ত্র শিক্ষার কি প্রয়োজন। তন্ত্র সাধনায় নানারকমের গোলমাল এসে পড়ায় তাকে দিব্য সাধনায় রূপান্তরিত করবার জন্য এবং লোকশিক্ষা দেবার জন্য ঠাকুরের এই সাধনা। এরপর এলেন তোতাপুরী বেদান্ত মতে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য। সেখানেও বললেন, দাঁড়াও মাকে জিজ্ঞাসা করি। তিন দিনে ব্রহ্ম উপলব্ধির শেষ কথা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন ঠিক আর গুরু তোতাপুরীর লেগেছিলো ৪০ বৎসর। এ প্রয়াস কেন? শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়কে যথাযোগ্য সম্মান দেবার জন্য। তারপর ইসলাম সাধনা। এই সাধন-ভাবে ভাবিত হবার জন্য মুসলমানের বেশভূষা আহারাদি নকল করলেন। আল্লা মতে সিদ্ধিলাভের পর খৃষ্টসাধনা করেন। এমনি করে একে একে সব মত পথে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করে উপলব্ধি করেন সব মত পথ সত্য। বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরীক্ষিত সত্য। এ তাঁর এক নতুন বাণী। তারপর এলেন শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। পাঁচ বছর বয়সে বিবাহের পর দীর্ঘ এগার বছর বাদে। এ আবার মহামায়ার কি পরীক্ষা! যাঁর সবরকম সাধনা শেষ তাঁর এখনও আর কি সাধনা বাকী। না, আছে। তাঁর নিজের

প্রয়োজনে। আপন লীলাসঙ্গিনীকে এনে রাখলেন নিজের কাছে। নিজের মনকে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন মন তেমনি নির্বিকার। বুঝলেন, সাধনা ঠিক হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন মাকে, "তুমি কি আমার সংসারের পথে নিয়ে যেতে চাও?" মাও দিলেন উত্তর সঙ্গে সঙ্গে, "না, না, সে কি। আমি তোমায় ধর্মপথে সাহায্য করতে এসেছি। আবার মাও ঠাকুরকে করলেন প্রশ্ন —"তুমি আমাকে কিভাবে দেখ?" ঠাকুর দিলেন সহজ উত্তর—"যে মা মন্দিরে, যিনি এ দেহের জন্ম দিয়ে বর্তমানে নহবত ঘরে বাস করছেন আর যিনি আমার পদসেবা করছেন—সবই এক।" অশ্রান্ত অবতারে দেখা যায় অবতারগণ তাঁদের শক্তির সঙ্গে নানাভাবে বিরহ লীলা করেন জগতকে শিক্ষাদান করে। যেমন শ্রীরাম অবতারে জনমদুঃখিনী সীতা, শ্রীকৃষ্ণ অবতারে চিরবিরহিনী রাধা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে শ্রীশ্রীমার আচরণ একেবারে পৃথক। শ্রীঠাকুর নিজে শ্রীমাকে ফলহারিণী পূজার রাত্রে ষোড়শীরূপে পূজা করেন এবং তাঁর সব সাধনার ফল তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। আরো বলেছেন হৃদুকে, "ও কষ্ট হলে আমারও কষ্ট নেই রক্ষা করার। সবশেষে শিবানন্দজী বলেন, অনেক আশ্রমে ঘুরেছি এবং দেখেছি শ্রীঠাকুরের পাশে শ্রীশ্রীমাকে যোগিনী, তপস্বিনী, বৈষ্ণবী ইত্যাদি বেশে। একমাত্র এখানেই দেখলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে শ্রীশ্রীমাকে রাজরাজেশ্বরী ষোড়শীরূপে। এতে মনে হয় স্বামী সন্তানন্দের অপূর্ব দিব্য অনুভূতি—মা নিত্যা, গৌরবোজ্জ্বলা। তাই এখানে মার সদা এইরূপে আবির্ভাব। ভাবঘন শেষে শিবানন্দজী মধুর কণ্ঠে ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত সকলকে আনন্দ দান করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটী পরিচালনা করেছিলেন স্বামী অমলানন্দ মহারাজ।

আরও আছে

শিবরাম পণ্ডা

অবাক সময় আসে অবাক জীবন
একটি করুণা ধারা একটি আশ্রয়
বৈদিক চেতনায় জাগে ব্রহ্মবোধ।
অনেক জানার আছে শ্রাবণী সন্ধ্যায়
অনেক খোঁজার আছে মায়ের সকালে
মধুর বাক্যের জাল পাতার কম্পন
উপনিষদ কম্পিত রেখায় তুলি টানে
"তমসো মা জ্যোতির্গময়"।
শরতের সাদাকাশ কল-কল নদী
ফুল হয়ে ঝরে পড়ে মানুষের মুখে।

কম্পিত কম্পিত রেখা উদার সীমায়
ধূপ দীপ জ্বালে একটি ছবির মোজে
অনির্বাণ নিষ্কম্প ছবি।
ভাষায় ভাবের গান ছন্দিত শব্দ
"মৃত্যো মৃহং মা –" অনেক কিশোর মুখে
পাতা ঝরা ঘরে যৌবন রেখায়।
সবুজ পাতার বনে জীবন দোলায়
জৈবিক এষণা শেষে শান্তি ছুঁয়ে আছে
কথা আছে গান আছে প্রাণ আছে
আরও আছে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।

স্বামী সত্যানন্দ—সাধারণের কাছে

অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য্য

স্বামী সত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন, একটা প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর তাঁদের কাছ থেকেও পাইনি। "ঠাকুরকে (স্বামী সত্যানন্দকে) বুঝতে পেরেছিলেন ?" প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে সবাই যেন কেমন একটা অভাব বোধ করেছেন। খুব সোজা সরল ভাষায় বলেছিলেন—"সম্ভব ছিল না।" স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের মনে হতে পারে এই বোঝার ব্যাপারটা কি, কিই বা তাঁরা বুঝতে পারেন নি, কেনই বা সম্ভব হলোনা। এখানে বোঝা অর্থে বলা যেতে পারে যে, শ্রীঠাকুরের সমস্ত জীবনের প্রতিটি ঘটনা প্রমাণ রাখে তিনি সেই ভগবৎ পুরুষ, সেই বিরাট সাধক, যিনি ইচ্ছানুযায়ী ওপারের সঙ্গে এপারের যোগাযোগ অনায়াসে করতে পারতেন—কিন্তু যা এখন অনেকে বোঝেন তা তখন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠেরাও বুঝেও যেন মনে রাখতে পারেন নি। এর কারণ কি ? স্বামী নির্ব্বেদানন্দ, তাঁর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম, বর্ত্তমান মঠাধক্ষ, এর চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন —"যখনই মনে হতো এবার ঠাকুরের ঈশ্বরীয় রূপকে ধরতে পেরেছি, তিনি এমন করে অন্য দিকে চিন্তাকে ঘুরিয়ে দিতেন যে, সে ঘটনা ধোঁয়ার মতো আচ্ছন্ন হয়ে যেতো।" অবচ অজস্র উদাহরণ এখন দেওয়া যেতে পারে যাতে এটা বোঝান মোটেই কঠিন হবে না যে, তিনি আবার এসেছিলেন, আবার অন্ধকারে অবহেলিত জীবন গুলোকে তুলে নিয়েছিলেন আলোয় উত্তাপে বাঁচাবার জন্য, তিনি সেই করুণাবতারের পথের পথিক, যাঁর পথচলা শুরু হয়েছিল কামারপুকুর থেকে। এটা দুঃখের যে তাঁকে তখন এমনভাবে চেনা সম্ভব হয়নি কিন্তু এটাও সত্য যে, এভাবেই তাঁরা আসেন, সবার সঙ্গে এভাবেই মিলে মিশে যান। চিনতে পেরেও যেন পারা যায় না। কেননা এ তো সেই নুনের পুতুলের সাগর মাপতে যাওয়া।

মহাপুরুষদের বুঝতে পারা যে কত কঠিন তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম সময় উপস্থিত। কাশীপুরের বাড়ীতে সবাই বুঝতে পারছেন আর দেরী নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এসে বসলেন তাঁর কাছে। মনে মনে চিন্তা করলেন যদি এই মুহূর্ত্তে তুমি বলতে পার যে, তুমি সেই ঈশ্বরেরই অবতার তাহলে বুঝবো, তাহলে মেনে নেবো। এই প্রশ্ন স্বামীজীর মতো লোকের মনে আসার কারণ তো সেই একই, বুঝেও যেন বুঝতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন—"ওরে যে রাম সেই কৃষ্ণ, আর এই দেহে সেইই রামকৃষ্ণ।" চমকে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ, শিউরে উঠলো তাঁর সমস্ত শরীর। তিনি তো মুখে কোন প্রশ্ন করেন নি, নিজের মনে ভেবেছেন। তার এই উত্তর। তারপর কতদিন চলে গেলো। এখন একথা জলের মতো পরিষ্কার বলে বোধ হয় যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার পুরুষ। মনে পড়ে সেই সব ঘটনার কথা। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো গঙ্গার বুকে। বরাহনগর আশ্রমের ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতাম গঙ্গার দিকে। অপেক্ষা করতাম অধীর আগ্রহে ঠাকুর (স্বামী সত্যানন্দ) কখন বেরিয়ে এসে বসবেন সবার মাঝে। জিজ্ঞেস করবেন কারো কিছু পরিপ্রশ্ন আছে কিনা। এমনি অনেক দিনে, অনেকের মুখে শুনেছি—"আশ্চর্য ব্যাপার—"

জিজ্ঞেস করতাম - 'কি ?'

উত্তর হতো—"যা ভেবে গিয়েছিলাম সে সবেরই উত্তর পেলাম, অথচ জিজ্ঞেস করতে হলো না।"

এসব ঘটনা অনেকেই জানেন। কাজেই এর পুনরাবৃত্তির কোন দরকার নেই। সাধারণ মানুষের কাছে স্বামী সত্যানন্দ কতটা ধরা দিয়েছিলেন এবং কিভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটা ঘটনায় তা

বলার চেষ্টা করবো। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক কোথায় থেকে জানতে পেরেছেন যে স্বামী সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমাকে দেখেই বললেন—

"আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনি ক'দিন যাবৎ ওদের সঙ্গে যুক্ত।" সংক্ষেপে সব বললাম। এবার আমি ওনাকে প্রশ্ন করলাম। "আপনি স্বামী সত্যানন্দকে দেখেছেন?"

উত্তর হলো—"হ্যাঁ, মাত্র একবার। আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি তখন দুবরাজপুরে। আগে যতটুকু তাঁর সম্বন্ধে জেনেছিলাম তা হলো তিনি রামকৃষ্ণ-সারদা গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সাধু। এটুকু জানার মধ্যে তাঁর নিজস্বতার কোন পরিচয় ছিল না। তাঁর দর্শনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় সামনের দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন। মনে হলো যেন একরাশ আলোর কণা নিমেষে আমাদের উজ্জ্বল করে দিল। কী অপূর্ব রূপ! দেখুন এই মুহূর্তেও সে কথা মনে করে আমার গায়ে শিহরণ জাগছে।"

সত্যিই তাই দেখলাম। ভাবলাম এ তাঁর করুণা। আবার কত লোককে দেখেছি, ঠাকুরের সামনে বসে অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। সংসারের আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেছেন অন্যজনের সঙ্গে। এমন কেন হয় এ কথাটার চমৎকার উত্তর আমার এক বন্ধু দিয়েছিল—

"এ তো হবেই। আমার বাড়ীতে যে রেডিও আছে তাতে কলকাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, আর তোমার বাড়ীর রেডিও তে দেশের তো বটেই বিদেশেরও অনেক Center ধরা পড়ে। মানুষও সেরকম। সবার আধার তো সমান নয়। যারা এইসব ঈশ্বরীয় পুরুষের বিন্দুমাত্র রূপকেও ধরতে পারে, তারা তো অনেকটা এগিয়ে গেছে।"

কিন্তু এই রূপ যারা সামান্যও ধরতে পারে তাদের বাক্য স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক তাই দেখেছিলাম এই অধ্যাপকের। যখন বার বার করে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর আপনার কি মনে হলো, অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে বললেন—

"আর কিছু বলতে পারবোনা। কি যে আমার তখন অবস্থা হয়েছিল তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলবো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনুভবের, বলার নয়। আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হলো না।"

এ কথাটা আমার মনকে স্পর্শ করলো—ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনুভবের। বলার নয়। তাঁর যখন করুণা হয় তখন আনন্দে দু'নয়ন ভাসে। বলার অবস্থা থাকে না। এর অন্যথা যখন দেখেছি তখন সন্দেহ জেগেছে এই একই কারণে। ঠাকুরের করুণা বলে, তার রূপের দর্শনে নির্দেশ বলে এমন অনেক কিছু অনেকে বলেছেন যা বিশ্বাস না হলেও ঠাকুরের নামে হচ্ছে বলে বিরুদ্ধতা করতে বেধেছে। তিনি যখন ভক্তদের মাঝে এসে দাঁড়াতেন, যে জ্যোতিতে তিনি সবার কাছে প্রকাশ হতেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতো না, ভক্তরা তাঁর ঈশ্বরীয় রূপে আপ্লুত হতেন। তবু কোন দিনও, কোন মুহূর্তের জন্যও তাঁকে আমি এবং আমার সংক্রান্ত কিছু বলতে শুনি নি। সব সময়ই বলেছেন—"মাকে বলে দেখবো।" অথবা বলেছেন "শ্রীশ্রীঠাকুরকে (রামকৃষ্ণকে) খুব ডাক—" এমনি সব কথা। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি নিজের প্রকাশ চাননি। নিজের রূপকে ঢেকে রাখার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। সেজন্যই যখনই তিনি কাউকে কৃপা করেছেন, কারুর কাছে অতি সামান্যভাবে প্রকাশ হয়েছেন, তার বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ যা তিনি অনুভব করতে কৃপা করেছেন, তা ব্যক্ত করার ক্ষমতাকে টেনে ধরে রেখেছেন। এক একজন ভক্তকে বলতে শুনেছি, তাঁর নির্দেশ নিয়মিত পান আবার অন্যদিকে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেছেন—"এ জীবনে তো শুধু তাঁর সাধনাতেই কাটাচ্ছি, কই আর অবধি তাঁর দর্শন নির্দেশ এসব তো কিছুই পেলাম না। তবে পাব এই ভরসাতেই দিন কাটাচ্ছি। তাঁর দর্শন পাওয়া কি সহজ!"

(ক্রমশঃ)

বাতিকার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে

সঙ্ঘেশ্বর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেবের পঞ্চসপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথি উৎসব

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের ৭৫তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বাতিকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছয় দিন ব্যাপী বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহোৎসব সম্পন্ন হলো। শ্রীঠাকুর বলতেন যেভাবেই হোক দিব্য কল্যাণময় শক্তিশালী কম্পনের সৃষ্টি করতে হবে—যাতে দেশ ও সমাজের সকল অশুভ অকল্যাণকর শক্তি প্রতিহত হয়। উৎসবের মাধ্যমে হাজার হাজার লোকের যে সমাবেশ হয় সেখানে দিব্য স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারলে সমষ্টি মনের একমুখী চিন্তায় ব্যক্তি ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। উৎসবের তাৎপর্য সেইখানেই। বাতিকার গ্রাম শ্রীঠাকুরের আদি লীলাপীঠ। সেই লীলা আজও চলে। 'অদ্যাপি সেই লীলা করেন গৌর রায়'। শ্রীঠাকুর বলতেন—'লোকে আজেবাজে টকি দেখবার জন্য পাগল হয় কিন্তু বৃন্দাবন লীলা গৌর লীলা—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা নিত্য, আজও চলেছে সেই ভাবে ভাবলোকে লীলা আকাশে—যার জন্য প্রয়োজন দিব্যচক্ষু (গীতা) 'প্রেমের কর্ণ' (কথামৃত) ও 'শুদ্ধ ইন্দ্রিয়' (বেদছন্দা) কিন্তু তা দেখবার তা শোনবার লোকের চাহিদা কই? বাতিকার গ্রাম সেই দিব্যলীলার মধুরতম স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। ছয় দিন উৎসবে সে আসর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। ৮ই জানুয়ারী হতে ১০ই জানুয়ারী কলকাতার বিশিষ্ট দল কর্তৃক যথাক্রমে অসংখ্য ভজন পূর্ণ বহু মর্মস্পর্শী সামাজিক নাটক 'বিবি আনন্দময়ী', সতীর দেহত্যাগ ও নটী বিনোদিনী যাত্রা অনুষ্ঠান হাজার হাজার মানুষ মন্ত্র-মুগ্ধের মত দেখে। ১১ই বিশ্বকল্যাণ হোম নাম. ও রাত্রে প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীকানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় গৌর লীলা গান করে সকলকে আবিষ্ট করেন। ১২ই জানুয়ারী প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি মনোরমভাবে সাজিয়ে নাম গান সহ বিশেষ শোভা যাত্রা সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ নামে আকাশবাতাস মুখরিত হয়। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের পূজা. হোম, আরতি, চণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং স্বামী অরূপানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ নাম গান করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত সেবা হয়। শৌর্য বীর্য শিব বিগ্রহ বিবেকানন্দ দেবের আবির্ভাব তিথি পূজায় সিউড়ী পুলিশ ব্যাণ্ডের গভীর গুরুগম্ভীর বাদ্য বিশেষ পূজার গরিমা মহিমা মাধুর্য সৌন্দর্যের ভাব সার্থক হয়। বৈকালে অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন ও স্বামী মঙ্গলানন্দ শ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব রচিত বিবেক প্রশস্তি হতে স্বামী বিমলানন্দ বিবেক বন্দনা পাঠ করে শোনান। সিউড়ীর শ্রীশ্রীসত্যানন্দ গীতিতীর্থের শিল্পীগণ সত্যানন্দ গান পরিবেশন করেন। রাত্রি সাতটায় বাউল সম্রাট পূর্ণ দাস ও সহ শিল্পীগণ কর্তৃক বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ১৩ই জানুয়ারী সমাপ্তি দিবসে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের জীবনী অবলম্বনে তথ্য চিত্র ও বাণী চিত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেখানো হয়। এ কয়দিন বাতিকার গ্রাম এক মহাদিব্য স্পন্দনে অনুরণিত হয়ে প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠে। বরানগর, দুমকা, সিউড়ী, দুবরাজপুর, প্রভৃতি শাখা হতে বহু সাধু ও সন্ন্যাসিনী মায়েরা উপস্থিত হয়ে উৎসব সার্থক করেন। শীর্ষসেবক স্বামী সুখানন্দ মহারাজ ও ডঃ শ্যামল চৈতন্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। স্থানীয় যুবকগণ সর্বতোভাবে সাহায্য করে।

যুগপুরুষ শ্রীসত্যানন্দ দেবের আবির্ভাব উৎসব

স্বামী হীরানন্দ

যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের ৭৬তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি স্মরণে বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে ৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রভাতী মাঙ্গলিক সানাই আর আকাশবাণীর "সুভাষিত" অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের "বেলছুটা"র বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচদিনব্যাপী মহোৎসবের সূচনা হয়। ঐদিন সকালে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও আরতি করেন ঠাকুরের মানসকন্যা পূজনীয়া শ্রীঅর্চ্চনা মা। এই উপলক্ষ্যে বারো ঘণ্টা হোম, ঠাকুরের রচনা থেকে পাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং নামগানও অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় প্রখ্যাত সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী শ্রীপ্রবীর মজুমদারের পরিচালনায় আকাশবাণীর "গীতসুধারস"-এর শিল্পবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে সত্যানন্দ গোপালের তিথি স্মরণে শ্রীঅর্চ্চনা মার লেখা গোপালের বাধাইয়া গান ভক্তমণ্ডলীকে সত্যানন্দ ভাবের উদ্দীপনে আনন্দ বিহ্বল করে তোলে। পূজান্তে বহু ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ অন্নপ্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। রাত্রে সঙ্ঘসচিব পূজ্যপাদ স্বামী সমুদ্ধানন্দজীর প্রচেষ্টায় আয়োজিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী নবনীতা চক্রবর্তী "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" গানটী গেয়ে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বিশিষ্ট শিল্পী ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠ সঙ্গীতে সর্বশ্রী প্রসূন ব্যানার্জী, মীরা ব্যানার্জী, জপমালা ঘোষ, সরোদে বাহাদুর খান সাহেব, নৃত্যে চিত্রেশ দাশ এবং তবলায় শঙ্কর ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ও আশ্রমের ব্রহ্মচারী গদাধর চৈতন্য প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭০ জন সাধুমহাত্মার সমাবেশে সাধু সম্মেলন ও সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। **সঙ্ঘপতি শ্রীমৎ স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ** উদ্বোধন ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ও সাধু মহাত্মাগণকে তাঁর ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে ঠাকুর সত্যানন্দদেবের বেদান্ত মূর্তি ও সমাধি অবস্থার অপূর্ব বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ঠাকুর ছিলেন বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ। বাল্যকালে অন্ততঃ আমার নিজের ধারণা ছিল যে যাঁরা বেদান্তের উপর নির্ভর করেন বা ঐ পথ আঁকড়ে আছেন তাঁদের ভেতর একটা শুষ্কতা এসে যায়। এ ধারণা যে ভুল, বুঝলাম যখন ঠাকুরকে দেখলাম। দেখলাম, বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ হয়েও তিনি কত লীলা করলো। কত আনন্দময় পুরুষ। পূর্ণ আনন্দময় সদায় সমাধিস্থ ছিলেন আমাদের ঠাকুর। এমন সময় গেছে যে ঠাকুর ধ্যান করছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে, ২২ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু তাঁর ধ্যান ভাঙেনি। যখন ভেঙেছে তখন তাঁকে দেখে মনে হতো, কি যেন এক অজানা রাজ্য থেকে ফিরে এসেছেন, জগতে আছেন একথা ভুলে গেছেন। তাকিয়ে দেখছেন চতুর্দিকে যেন কাউকে চেনেন না। ক্রমে ক্রমে জগত লীলার ক্ষেত্রে নেমে এসে আশেপাশে যারা বসে আছে তাদের চিনেছেন। ঠাকুরকে দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে সত্যকার বেদান্তবাদী সাধু কেমন হয়। ঠাকুরকে দেখেছি, গান হচ্ছে, শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। সমাধি কাকে বলে জানতাম না। রামকৃষ্ণদেবের সমাধির কথা শুনেছিলাম। এখন ঠাকুরকে দেখে বুঝলাম সমাধি কি? গান শুনতে শুনতে যখন সমাধিস্থ হয়ে যেতেন তখন দেখেছি তাঁর গ্রীবা ঈষৎ বেঁকে গেছে, শ্রীমুখে স্মিত হাসি, সম্বিৎ হারা। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে তবুও সমাধি ভঙ্গ হয়নি। ঠাকুরের কাছ থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, ঠাকুর সমাধিস্থ হলে তাঁকে আবার পৃথিবীর ধূলায় নামিয়ে আনতে হলে একটু নাম করার প্রয়োজন। তাই ঠাকুর সমাধিস্থ হলে নাম করা হ'ত। প্রথম প্রথম উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে নাম হ'তো। একদিন ঠাকুর বললেন, দেখ, তোমরা অত চীৎকার করে নাম ক'রো না, ওতে আমার ব্রেনে আঘাত লাগে। ধীরে ধীরে মিষ্টি কণ্ঠে নাম করবে। তারপর থেকে সেইভাবে নাম করা হ'তো। এমন অবস্থা হ'ত যে আমাদের পক্ষে ৪।৫

ঘণ্টা একটানা নাম করাই অসম্ভব হ'য়ে প'ড়তো। ঠাকুরের সন্বিৎ ফিরে আসতো যখন তখন দেখতাম তাঁর ঠোঁট দুটি প্রথমে একটু কেঁপে উঠতো, তারপর আরও কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাতেন। এরাজ্যে তো ছিলেন না তাই এ রাজ্যের মানুষ দেখে তাদের চিনতে পারছেন না। কে কোথাকার লোক কাউকেই চেনেন না। শূন্যদৃষ্টি, ক্যালফেলে দৃষ্টির কথা কথামৃতে যে বলা আছে, এ সেই দৃষ্টি। কিছুক্ষণ ঐভাবে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, কতক্ষণ নাম ক'রেছো। কেউ ব'ললো—ঠাকুর, পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, ঠাকুরের ভোগের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। "তাই নাকি !" ব'লে আসতে আসতে উঠে ভোগ নিবেদন করতে গেছেন। এইভাবে যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না সেটা চোখে দেখলাম, তার স্বরূপ লক্ষণ কি তা শিখলাম, জানলাম। আবার যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন—যে সব ছেলেরা নিত্য তাঁর চারপাশে উপস্থিত হ'ত তাদের নিয়ে যখন খেলতেন, তখন আবার অন্য মূর্তি। তখন তাদের খেলার সাথী—শিশু সুন্দর ঠাকুরের সে কি অপূর্ব লীলাচঞ্চল রূপ। ঠাকুরের সমস্ত রূপের বর্ণনা করা এই অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তাই আজ শুধু তাঁর বেদান্ত মূর্তির কথা, সমাধির কথা এবং সমাধি অবস্থার পরের কথা কিছু বলে শেষ করলাম। যেসব সাধু মহাত্মাগণ কত কষ্ট স্বীকার ক'রে এই সম্মেলনে এসেছেন তাঁদের চরণে বারবার ভূলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করি। জয় ঠাকুর :

স্বামীজীর ভাষণের পর **স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ** ঠাকুরের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন - শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এসেছি আমরা। যাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই, তাঁর জন্মদিনে আমরা সমবেত হয়েছি। তিনি সন্ন্যাসী, জন্মমৃত্যুর অতীত তবাপি তাঁকে স্মরণ করছি কেন ? তার কারণ আমার ধারণায় আমার স্মৃতি পথে কবে পেয়েছি তোমাকে ? এ কথা বলবার দিন আজ পরশ করা যায় না যাকে, এমনি দিনে তাঁকে পেয়েছি বলেই আজ এই আনন্দ-উৎসব। ঠাকুর সম্বন্ধে দুটি কথা বলবো। প্রথম কথা হচ্ছে :—

এখানে তাঁর প্রত্যেক ছবিতে দেখলাম তিনি হাতজোড় করে রয়েছেন। এমন কি শ্রীমন্দিরে তাঁর যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও দেখি তিনি হাতজোড় করে বসে আছেন। সকলের প্রতি বিশেষ করে সাধুদের প্রতি তিনি ছিলেন সদা শ্রদ্ধাশীল। সর্ব সম্প্রদায়ের সাধুদের তিনি ডাকতেন উৎসবের দিনে। যাঁরা ঈশ্বরের জন্যে ঘর ছেড়ে এসেছেন বিশেষ করে তাঁদের তিনি ডেকে এনে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে সেবা করতেন। রামদাস বাবাজী তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন নিত্যানন্দের বংশধরকে ভালবাসতে। বলতেন, তাঁদের কাউকেই মানুষ মনে ক'রো না। ঠাকুর সত্যানন্দদেবও রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত যে যেখানে আছে তাদের সকলকেই সম্মান দিতেন। রামকৃষ্ণ একটা লোক, একটা পৃথিবী - এই ভাবনা নতুন করে ভাববার আছে অর্থাৎ রামকৃষ্ণের ভক্ত যে যেখানে আছে তাদের মানুষ ভাবে দেখো না।

আর একটি বিষয় হচ্ছে এই কাঁচের মন্দির অর্থাৎ মনের মণিমন্দির—দেখবার বস্তু। এই মন্দিরের বিগ্রহগুলির দিকে তাকালে দেখবেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত এরকম বিগ্রহ কোথাও নেই। বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের যে ধরণের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এখানেও ঠিক সেই ধরণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তফাৎ এই যে, এখানকার মূর্তির দাঁত ভাঙ্গা নয়, কোথাও একটি wrinkle নেই। তেমনি অপূর্ব সারদা মা'র ষোড়শী রূপের মূর্তিটি। একমাত্র সত্যকার শিল্পীই এর মর্যাদা বুঝবেন। এই মূর্তি গড়ার সময় সত্যানন্দদেব শিল্পীকে নিজের কাছে বসিয়ে তার ভুলত্রুটি নিজে দেখিয়ে দিয়ে তৈরী করিয়েছেন। এ মূর্তি তাঁর ভাবমূর্তি। তাঁদের ভেতরকার ছবি ভেতরকার রূপই বাইরে ধরে দিয়েছেন। তারপর আর একটি জিনিস তিনি যা করেছেন সেটা আমি সোচ্চারে ব'লবো তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। ঠাকুর আর মাকে তিনি পাশাপাশি বসিয়েছেন। রামকৃষ্ণ পৃথিবীর মধ্যে এ দুটি একটি বিরল। কারণ আমরা জানি ঠাকুর যখন ছিলেন মা তখন ঠাকুরের চোখের সামনে আসেন নি। নিজেকে ভীষণভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সারাদিনে একটিবারও প্রায়ই দেখা হয় না ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুরের ভোগটিও কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে কোন ক্ষোভ ছিল না, দুঃখ ছিল না। বলতেন, কি পুণ্য করেছি যে রোজ তাঁকে দেখতে পাব। কিন্তু যে মুহূর্তে

ঠাকুর অপ্রকট হলেন, মা নিজেকে প্রকাশ করলেন। কারণ তখন যে তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। একই নেতৃত্ব বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিতে হয়েছিল। নিমাই যতদিন ছিলেন, শচীমা ততদিন ছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া সামনে আসেন নি। সেই বিষ্ণুপ্রিয়াই নবদ্বীপে শচীমার মূর্তি ও নিমাই-এর পাদুকা প্রতিষ্ঠিত করলেন। যখন প্রয়োজন হ'ল সামনে এলেন। তেমনি সারদা মাকেও প্রয়োজনে সবার সামনে আসতে হ'লো। যখন বিবাদ হলো উদ্বোধন ঠিক কাজ করছে না মঠ ঠিক করছে? মা বললেন, দুজনেই ঠিক কাজ করছে। বিপদে আপদে রক্ষা করছেন মা।

সবাই চায় বাবাকে মাকে একসঙ্গে পেতে। রামকৃষ্ণকে সারদামাকে এক সঙ্গে পেতে ভাল লাগলে তাঁদের যুগলমূর্তি ভাবতে ভাল লাগবেই। তখন রামকৃষ্ণদেব ও সারদা মাকে যে পাশাপাশি রাখবে এতো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু সব জায়গায় দেখি বৈধব্যের চিহ্ন সারদামার মূর্তিতে। শ্রীরাধাকে কি বিরহরূপে সাজান যায়? এই বিরাট ভাবনাকে সত্যানন্দদেব রূপায়িত করলেন সারদামাকে মায়ের মত সাজিয়ে, মনের মত করে সাধ দিয়ে সাজিয়ে, মা আর ঠাকুরকে যুগলরূপে পাশাপাশি বসিয়ে। মনভূমিই সত্য—যা ঘটে তা সত্য নয়। এই সত্যকে তিনি রূপ দিয়েছেন সারদা মার বিগ্রহে। তাই দেখি আমাদের মা বিধবা নন, তাঁর মাথায় সিঁদুর আছে—তাঁকে আমরা মনের সাধে সাজাতে পারি – তিনি আমাদের চিরন্তন মা।

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের মধুর কণ্ঠে ভজন গানও সকলকে খুব আনন্দ দিয়েছে।

শ্রীগুরু সঙ্ঘের রামানন্দ ব্রহ্মচারী বলেন, আজকের এই সাধু সম্মেলন প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শুনেছি তখন গঙ্গা যমুনার তীরে তীরে ছিল সব আশ্রম। তাঁরাও সাধু সম্মেলন ডাকতেন—ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আলোচনা হ'ত সেই সভায়। আজও গঙ্গা মার কোলে এই পুণ্য আশ্রমে সাধু সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সব সম্প্রদায়ের সাধুরা এসেছেন। অতি মনোরম এই আশ্রম। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন সত্যস্বরূপ। তিনি ২১।২২ ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এতক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকা মানুষের শরীর নিয়ে সম্ভব নয়—মানুষ পারে না। যুগপুরুষ স্বামী সত্যানন্দদেব সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সত্যে সব উৎসর্গ করেছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। সত্যই ছিল তাঁর ধর্ম তাই তাঁর নাম সত্যানন্দ।

আশ্রম পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সোমানন্দ বলেন, সন্ন্যাসীর ধারণা সর্বাগ্রে আসে অদ্বৈতবাদ থেকে। ভক্তিবাদ নিশ্চয়ই ভাল তবু সন্ন্যাসীর চিন্তা হবে অদ্বৈত মার্গের। সন্ন্যাসীর কোন সংস্কার নেই। কিন্তু আজকাল আমরা ভক্তিবাদে বড় বেশী জড়িয়ে পড়ছি। এটাও এক প্রকারের মায়া। তাই আমার নিবেদন অদ্বৈতবাদের কথা কিছু শোনান আপনারা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রেমানন্দজী বলেন, আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভারতবর্ষ। এই আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে জড়বাদ থেকে সুরু করে বহু মতবাদ উচ্চারিত হয়েছে। তথাপি শুদ্ধবাদই এখানে প্রথম স্থান পেয়েছে। ঈশ্বর লাভই মানুষের চরম কাম্য। সেই ঈশ্বরলাভের পথ যিনি দেখিয়ে দেন তিনিই গুরু। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ অন্তরের সম্বন্ধ। সাধক গুরুমুখী না হলে সাধন জীবনই গড়ে ওঠে না। আবার ভক্তি না থাকলে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, গুরু বাক্যে বিশ্বাস বা নিষ্ঠা আসে না। আর তা না হলে সাধনজীবনের মূল কথা ব্রহ্মচর্য পালন, সজ্জনদের প্রতি শ্রদ্ধা কিছুই সম্ভব হয় না। নচিকেতা যিনি যমরাজের দুয়ারে গিয়ে তিনদিন উপবাস থাকার পর যমরাজের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান চাইলেন - সেই নচিকেতার মত নিষ্ঠা প্রেম না থাকলে ব্রহ্মোপলব্ধি বা ভগবৎ লাভ কিছুই হবে না। কাজেই ভগবৎ রূপরস আস্বাদন করতে হ'লে চাই ভক্তি। আর ভগবৎ রূপ রস আস্বাদনে যে কি পরমানন্দ লাভ হয় তা সে যে পেয়েছে সেই বুঝেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, মা, আমাকে শুকনো জ্ঞান দিসনে, রস বসে রাখিস। শুদ্ধের জন্য ভগবান এ কথা ভারতবর্ষ-ই বলেছে। এইভাবে প্রহ্লাদের রুক্মভক্তি ও হিরণ্যকশিপু বধের পৌরাণিক পৃষ্ঠভূমি এবং উপনিষদ গীতাদি শাস্ত্র প্রমাণ সহায়ে প্রেমানন্দজী

অকাট্য যুক্তির অবতারণা ক'রে অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেন যে, অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, শক্তিবাদ, ভক্তিবাদ সবই ভারতবর্ষে স্থান পেয়েছে কিন্তু সবকে ছাপিয়ে ভক্তিবাদই ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সবেরই মূল গুরুবাদ। কাজেই গুরুমুখী হয়ে গুরু প্রসাদ পাথেয় করে অমৃত-পথে আমাদের চলে যেতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী এবং শ্রীসত্যানন্দদেব সেই আদর্শ-ই আমাদের দিয়ে গেছেন। তাই আজকের এই পুণ্য দিনে তাঁদের চরণে প্রার্থনা জানাই যে, হে প্রভু, এই মহান আদর্শে তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ কর—আমাদের সত্যকার সাধু করে ধন্য কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাঠবাড়ীর বৈষ্ণবদাস বাবাজী বলেন, মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম মানুষের মনুষ্যত্ব ঈশ্বরাভিমুখীনতায়। যুগে যুগে অবতার আসেন মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করে ধর্মকে সংস্থাপন করতে। ঈশ্বরাভিমুখীকেই যথার্থ মানুষ বলা হয়। যিনি মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করেন তিনি মহামানব - মহাপুরুষ দেবতা তাঁর দর্শনে স্পর্শনে তাঁর বাক্য শ্রবণে মানুষের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে যায়। ঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন এমনি এক মহাপুরুষ আমরা স্থূলভাবে দেখছি যে, এই কজন বুঝি ওঁর শিষ্য কিন্তু বাস্তবে তা নয়, তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই ঈশ্বরাভিমুখী করার স্পন্দন ছড়িয়ে যান। নাম সংকীর্তনই কলিতে শ্রেষ্ঠ উপায়। যার যেমন ইচ্ছা সেইভাবেই সর্ব অবস্থায় নাম করা উচিত :---সত্যানন্দদেবকে যাঁরা গুরু রূপে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁরা তাঁর আদেশ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে একদিন 'একোঽহং' উপলব্ধি লাভ করে ধন্য হয়ে যাবেন।

এরপর **স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ** আশ্রমের পক্ষ থেকে সমাগত সাধুমণ্ডলীকে প্রণাম নিবেদন করে বলেন, হরি ভূভার হরণ করেন তাই তিনি হরি – তাঁরই প্রাণবিন্দু প্রত্যেক সাধুর মধ্যে রয়েছে। কাজেই আপনারাও ভূভার হরণ করছেন, আপনারা হরির প্রতিমূর্তি – আপনারা আমাদের কৃতার্থ করুন, আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করুন। আমাদের ঠাকুর সাধু পূজা কেমন করে করতে হয় দেখিয়ে গেছেন। এই আশ্রমের সাধু সম্মেলনে বহু মহাপুরুষেরা এসেছেন। একবার দুর্গাপুরী মা এসেছেন, হলঘরে বসেছেন। আমাদের জাগ্রত জীবন্ত ভগবান থালিপায়ে হলঘরের কোনে যেখানটিতে মা বসে ছিলেন সেদিকে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে বসে মাকে পূজা নিবেদন করেন—Knelt down before the mother and offered her worship. গুরু তিনি, আচার্য তিনি —আচরণ দ্বারা দেখিয়ে গেলেন সাধু বরণ সাধু পূজা কি করে করতে হয়। ঠাকুরের দৃষ্টান্ত, ঠাকুরের আদর্শ স্মরণ করে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের আমার ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানাচ্ছি। জয় ঠাকুর!

এবার আমাদের স্বামী অরূপানন্দজী কিছুক্ষণ সকলকে নাম গানে মাতিয়ে রাখলেন। নাম গানের পর মণিমন্দির অঙ্গনে সাধু সেবা হ'ল। সাধু সেবান্তে সঙ্ঘসচিব পূজ্যপাদ স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজী ও দুবরাজপুর আশ্রমের শীর্ষ সেবক পূজনীয় স্বামী ভূপানন্দজী আশ্রমের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মহাত্মাগণকে নববস্ত্র, শ্রীগীতা ও দক্ষিণা সহ সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে গঙ্গাতীরে মণিমন্দির প্রাঙ্গণে কুম্ভমেলা সদৃশ পুণ্যদর্শন এই সাধু সম্মেলনের পবিত্র অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন।

এদিন বিকেলে ঠাকুরের বাণী নিয়ে শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক মহাশয়ের মনোজ্ঞ আলোচনার পর আশ্রমের সাধু ও ভক্তগণ ঠাকুরের জীবনবেদ অবলম্বনে শ্রীঅর্চনা মার লেখা "এক মুঠো আকাশ" গীতি-আলেখ্যটি পরিবেশন করেন।

তৃতীয় দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল **শিশু সম্মেলন**। অপরাহ্ণ থেকে বসেছিল শিশুদের বিরাট মেলা। শিশুরা প্রধান অতিথি রূপে পেয়েছিল ২৪-পরগণা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক শ্রীরাখাল দাশগুপ্ত মহাশয়কে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তোতলী বুলির আবৃত্তি, হলদিয়ার বাবার অফিস F. C. I.-দেখে আসার অভিজ্ঞতা বিষয়ে চার বছরের একটি ছোট্ট ছেলের আধো আধো স্বরে ব্যক্তিত্বপূর্ণ সপ্রতিভ extempore speech, শিশু শিল্পীদের নাচগান, স্থানীয় ভিবজিওর ক্লাবের ছেলেমেয়েদের যোগব্যায়াম ও যাদুকর শ্রীবি. ভি. অধিকারীর চিত্তাকর্ষক যাদুবিদ্যাপ্রদর্শন শিশুদের

অনুষ্ঠানটীতে অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ছোট বড় সকলকে দিয়েছে অশেষ আনন্দ। মূল পরিদর্শক মাননীয় শ্রীরাখাল দাশগুপ্ত মহাশয়ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যান এবারের শিশুসম্মেলনের।

সন্ধ্যায় মাইক্‌ও বিদ্যুতীবাতী কিছু কণা একজোড়া নৌকার বুকে ফুলমালায় সাজান শ্রীঠাকুরের বিরাট প্রতিকৃতি নিয়ে গন্ধাবকে ঠাকুরের নামগান সহ নৌশোভাযাত্রাটিও হয়েছিল খুবই মনোরম।

১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক ভাগবতাংশ পাঠ করেন। বাসন্তী দেবীর প্রখর স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব সংস্কৃত উচ্চারণ, আবেগ মধুর কণ্ঠে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও বচনভঙ্গি লীলাচিত্রগুলিকে যেন জীবন্ত করে তুলেছিলো। মধুর প্রবণে শুনতে শুনতে ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদনে ভক্তের হৃদয় বারবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আর নয়নে ঝরেছে আনন্দাশ্রু। ভাগবত পাঠের পর কলকাতার বিখ্যাত বাউল শিল্পী শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও সম্প্রদায়ের বাউল গানও শ্রোতাদের প্রকৃত আনন্দ দান করে।

উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে 'চাঁদনী সঙ্ঘের' ছেলেমেয়েদের শ্রীঅর্চনা মা'র লেখা "মদনমোহন" নাটকের অভিনয়। স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দের পরিচালন দক্ষতা এবং ছেলেমেয়েদের অভিনয়নৈপুণ্যগুণে নাটকের ভাবটি যথাযথ রূপায়িত হওয়ায় নাট্যাভিনয়টী দর্শকদের খুবই আনন্দ দিয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১১ই ফাল্গুন কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসভবন "ছায়াবীথি"তে ঠাকুরের ৭৬তম জন্মদিনটীও সাড়ম্বরে পালিত হয়। সেবাশ্রম থেকে সকল সাধু ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য নানাস্থান থেকে ঠাকুরের বহু ভক্ত সন্তান ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাতে 'ছায়াবীথিতে' উপস্থিত হন। ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও নাম ভজনের পর সকলেই প্রসাদ পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করেন। আনন্দময় বিগ্রহ সত্যানন্দদেবের আবির্ভাব স্মরণ পূজো এবারও বলবো সত্যানন্দদেবের কৃপাতেই সবদিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত রূপে সুসম্পন্ন হয়েছে।

ও ফাগুন

মীরা রায়

ফাগুন তুমি এলেই যদি
তারেও আনো ফিরে
সাত রাজার ধন মাণিক নিল
ব্যথার শ্রাবণ ঘিরে—
তারে ছাড়া চেউ জাগে না
আসে না জোয়ার জলে
তাটার টানে দুখের চড়া
জাগে পলে পলে

ও ফাগুন তারে বোলো
আমি ভাসি নয়ন নীরে।
তারে ছাড়া সুর জাগে না
বুলবুলিদের গানে
একতারাতে তান বাজে না
সে পথিক বাউল জানে
বালিয়াড়ী ভাঙে শুধু
মহাকালের সাগর তীরে॥

আবার এস নামি

স্বামী অরূপানন্দ

নিদাঘের তপ্ত রাঙ্গা দিন
অলস মধ্যাহ্নে আমি
বসে বসে ভাবি
কতদিন গেল চলে
আর কতদিন আছে লিখা
এ পান্থশালায়
পথিকের পথ চলা হবে না কি শেষ—
পাব না কি ও চরণ চিহ্ন আঁকা
আলোর দুয়ার
আনন্দের নিত্য তীর্থে লবে চল মোরে
হে জ্যোতির্ময়।
ও রূপ গহনে আজি
হোক মোর লয়।
হে মোর দেবতা।
তুমি তো বলনি কোনও দিন
সোহাগ বাঁধন নেবে
ভুল ভোর ছিন্ন করে যাবে চলে চিরদিন তরে
বিসর্জিয়া তনুরেরে
বাস্তবের তপ্ত মরুতীরে।
তুমি তো বলনি বারেক
তব লীলা অপ্রকাশে
রহিবে না ক্ষণ তরে আমাদের লাগি
অসীমের অভিসারে; যাবে চলে
তুচ্ছ করি সব ডাকাডাকি॥
তুমি তো বলনি প্রভু
শুনিবে না হৃদয়ের আর্ত ক্রন্দন
যত ব্যথা যত জ্বালা আসুক জীবনে
ভরিয়া উঠিবে বুক ব্যর্থ হাহাকারে
অনন্তের অনন্ত করুণা তবু মিলিবে না
হৃদ্কক্ষে কন্দরে তিলে তিলে নিঃশেষিত হবে—
তারই জন্য আসিয়াছ ভবে।
না—না — এতো নয় সেই বাণী
মোর দেবতার
ক্ষণব্যথা হেরিলে যাঁর
ছলছল উছল দুটী নীল চোখ
ভেসে যেত গণ্ড দুটী আকুল আবেগে
মুছে দিতে সব ব্যথা তার।
মায়ের মমতা নিয়ে—
নিয়ত যে দিয়েছে অভয়
আমি আছি কোনও ভয় নাই
ইহকাল—পরকাল সব ভার মোর
রহিব সদাই পাশে
ডাকিলেই আসিব আবার।
মা'র কাছে ভুল শোধ—সবই খেলা জেনো
পূর্ণ করি সব অক্ষমতা
মুক্তির আলোকতীর্থে স্নাত করি তোমা সবাকারে
দিব্যধামে দিব যে আশ্রয়
যেথা নিত্য নবনব লহরিছে সুর মূর্চ্ছনা
স্পন্দনে স্পন্দিত সদা
রামকৃষ্ণ জয়
সত্য শিব আনন্দের গানে
সৃষ্টি স্রষ্টা সব গীতিময়
সব সুরময়।
হে নূতন দিনের চির নবীন সুন্দর
তোমারই দেওয়া বুকে তুমি যে রয়েছ নিতি
আমারই আপন হয়ে
আমি যে তোমারই সখা
চির জনমের
তুমি যে আমারই নাথ
এ হীন পাত্রের।
ওগো ও অপরূপ হরি।
তুমি তো বলেছ কতবার
যে যার সে তার—
তোরা যে আমার
পিতা-মাতা সখা-বন্ধু
সবই তো আমি
কোলে তুলে নেব সবে
নেব সব ক্ষমি
আজি এ তাপহরা দিনে
তোমাকে জানাই ওগো অখিলের স্বামী—
নিখিলের নিঃস্ব বুকে
সত্যানন্দ রূপে আবার
এস এস নামি॥

দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীঅর্চ্চনাপুরী মা কর্তৃক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি।

দুবরাজপুরে শ্রীশ্রীসারদা কাত্যায়নী পূজা খুব ধুমধামের সঙ্গে শেষ হল। উৎসবান্তে দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম অন্তর্ভুক্ত শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠের বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রদের শ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পুরস্কার বিতরণ করেন আমাদের শ্রীঅর্চ্চনা মা। ছোট্ট সুন্দর অনুষ্ঠানের সুরুতে তিনি যে ভাষণ দেন, তার কিয়দংশ এখানে পরিবেশিত হল :

"আজকের এই পুরস্কার বিতরণী সভা দেখে সিউড়ীর সেই সভা মনে পড়ছে যেখানে আমাদের ঠাকুর নিজে পুরস্কার বিতরণ করতেন। ঠাকুরের হাতে পুরস্কার পাবার উৎসাহে ছাত্ররা প্রাণ চেলে করতো চরম কৃতিত্বের পরিচয় দিতে। কারণ যিনি দিচ্ছেন তাঁর সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, যারা পাচ্ছে তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অনন্ত, এর মূল্য অনেক বেশী। সাধারণ ভাবে আমরা যেসব জিনিস পুরস্কার হিসাবে পাই, তার চেয়ে বড় একটা পুরস্কার আছে— সেটা নৈতিক পুরস্কার। ছাত্ররা জাতির মেরুদণ্ড। আগামী দিনের সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখ চেয়ে। তাই তাদের জীবনকে তৈরী করতে হবে। আশ্রমের বিদ্যালয়ের এইটাই বিশেষত্ব। এখানে শিক্ষার মূল ভিত্তি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এবং প্রত্যেক ছাত্রকে সেটা মেনে নিতে হবে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিনের সঙ্গে সমবেত প্রার্থনা, পাঠ, ভগবদ্ বিষয়ক আলোচনাদিও থাকবে এবং ভগবৎমুখীনতাকে ছাত্ররা ভালবেসে নেবে, দায় সারা করে নয়। লেখাপড়া খেলাধুলার মতই এটুকুও যেন তাদের প্রিয় হয়। চরিত্রবত্তাই ছাত্রজীবনের মূল কথা। স্কুল কলেজ হবে মানুষ গড়ার কারখানা। ঠাকুর বলতেন—বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দিয়ে তার মান নির্ণয় হয় না, মান নির্ণয় হয় কটা ভাল ছেলে মহৎ ছেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে তাই দিয়ে। ছাত্রজীবনে দরকার একাগ্রতা। আমাদের ঠাকুর তাই ছাত্রদের বসিয়ে দিতেন খানিকক্ষণ ধ্যান করতে। ঠাকুর তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্রতার মাধ্যমে ধ্যান চিন্তার মাধ্যমে এবং নিষ্কামানুবর্ত্তিতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উন্নতির চরম শিখরে এবং নিজের জলন্ত জীবন সামনে রেখে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কিভাবে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদেরও এগোতে হবে। শিক্ষকদেরও মনে রাখতে হবে এ বিষয়ে তাদেরও রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব।"

প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী মহানন্দ বলেন : "কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে পাই—পার্ব্বতী শিবকে পাবার জন্য প্রথমে মদনের সাহায্য নিলেন, কিন্তু বিফল হলেন। তারপর তিনি ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারা শিবকে লাভ করলেন। একমাত্র ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা, সত্য ও শিবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ত্যাগের অর্থ নিজেকে রিক্ত করা নয়, ত্যাগের মানে অংশকে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিকের ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, ছোট সুখকে ত্যাগ মহৎ আনন্দের জন্য। ত্যাগের এবং ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তির বিকাশ। ভগবান যীশু বলেছেন "যত আমরা ক্ষুদ্র মন নিয়ে থাকবো ততই ছোট হয়ে যাব। যে বিনম্র সেই পৃথিবী জয় করে।" গৌতম বুদ্ধ রাজা ছিলেন, কিন্তু মানুষের জন্য পথে এসে দাঁড়ালেন এবং তখন সারা বিশ্বের হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন একটি দুটী মানুষকে ভালবাসা মায়া, সবাইকে সমান ভালবাসা দয়া। তারপর বললেন—দয়া কি রে সেবা, সেবা, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা। বিবেকানন্দ সেই মহামন্ত্রকে রূপ দিলেন, নিজেকে বিলিয়ে দিলেন জগৎকে ভালবেসে। এই ত্যাগের, এই বিলিয়ে দেওয়ার একটা আনন্দ আছে। রামচন্দ্র বনে গেলেন কিন্তু বনবাসে একটুও দুঃখ পাননি,

কারণ তিনি বনকে ভালবেসেছিলেন। তাই দেখালেন—সীতার বিরহে গাছপালা নদী সব যেন মুহ্যমান। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময়ও দেখি প্রকৃতির কান্না মানুষের জন্য। তপোবনের শিক্ষার এই বিশ্বপ্রেমই মূল কথা।...ঝড় কখনও চিরদিন টেকে না, ঝড় কেবলমাত্র একটি সংকীর্ণ স্থানকে কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, সকলকে দূরে ঠেলে দেয়। তপোবন শিক্ষার শান্ত বায়ুপ্রবাহে আছে নম্রতা সাত্ত্বিকতা, আছে তেজ, ত্যাগ, আছে সংযমের ঔজ্জ্বল্য, আছে প্রেম ও মৈত্রীর ভাবনা। এ পরিবেশ শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ হাওয়া কাউকে দূরে ঠেলে না, বিচ্ছিন্ন করে না, সকলকে আপন করে নেয়। এই তপোবন পরিবেশে যারা মানুষ হচ্ছে, আশা করি তারা অনেক বড় হবে, বন্ধুর আশ্রয়স্থল হবে।"

এই সভার সভাপতি স্বামী সুরেশ্বরানন্দ তাঁর ভাষণে বলেন—"সিউড়ীতে যখন প্রথম শিক্ষাবিস্তারপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই আমি শ্রীঅর্চনা মাকে জানি। শ্রীঠাকুর সার্থক শিক্ষক আর অর্চনা মা সার্থক ছাত্রী এবং আজ তিনি সার্থক আচার্যারূপে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর ভাষণে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা বলতে আমরা পেয়েছি নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ও চরিত্রবত্তা। এটা শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, শিক্ষক অভিভাবকদের জন্যও বটে। যথাসর্বস্ব ত্যাগী শ্রীঠাকুরের যোগ্য সন্তান স্বামী ভূপানন্দ যেভাবে আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ পরিচালনা করছেন তা শিক্ষণীয়। ত্যাগের ভিতিভূমির, সেবার আদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হবে নিজেদের আচরণের দ্বারা। আমি সারদা মায়ের নামের এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।"

সম্পাদকের বিবরণীতে আমরা পুরস্কার বিতরণ বিষয়ে একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ পেলাম। সেটা হচ্ছে কমপক্ষে আটটি নগদ স্কলারশীপের ব্যবস্থা। সম্পাদক মহাশয় জানালেন :

"এই বৎসরের পুরস্কার বিতরণী উৎসবের প্রধান আনন্দ সংবাদ এই বিদ্যাপীঠের নিম্নশ্রেণী হ'তে উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীদের যারা এই বিদ্যাপীঠেই পড়াশুনা করছে, তাদের মাসিক দশ টাকা হিসাবে বার্ষিক ১২০ টাকা বৃত্তিদানের সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাধন্য কর্মযোগী স্বামী ভূপানন্দ মহারাজ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই সাধু সংকল্পে সহায়তার জন্য কয়েকজন সম্মানীয় বিদ্যামোদীও সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন।

এই সাধু উদ্দেশ্যে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি **শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক** মহাশয়। তিনি তাঁর স্বর্গত পিতা এবং বাংলা সাহিত্যাকাশের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবিসুন্দর **কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের** স্মৃতির উদ্দেশ্যে সপ্তম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে বার্ষিক ১২০ টাকা : বোলপুর আদালতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র **শ্রীযুক্ত শিবপদ ঘোষ** তাঁর অকাল-প্রয়াত স্নেহপুতলী পুতুলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে বার্ষিক ১২০ টাকা ও সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে **ডঃ স্বামী মহানন্দ** মহারাজ ওই আশ্রমের প্রাক্তন ঈশ্বরসেবক ও আজীবন শিক্ষাব্রতী স্বর্গত **স্বামী দেবানন্দ** মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১২০ টাকা বৃত্তি ৮ম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে দিচ্ছেন। এছাড়া দুবরাজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে স্বামী **ভূপানন্দ মহারাজ** নবম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেবের পুণ্য নামাঙ্কিত বৃত্তি ১২০ টাকা, দুবরাজপুর আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি, আজীবন বিদ্যোৎসাহী ও এই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন সম্পাদক স্বর্গত **নবগোপাল** দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রথমস্থানাধিকারীকে ১২০ টাকা, শ্রীশ্রীসারদা নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী ও উঃ প্রাঃ শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ এই বিদ্যাপীঠে পাঠরত ছাত্রকে দুবরাজপুর আর, বি, এস, ভি, উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির আজীবন সদস্য, স্থানীয় জনহিতৈষী ও বিদ্যানুরাগী স্বর্গত **রামময় নায়েকের** স্মৃতির উদ্দেশ্যে বার্ষিক ৬০ টাকা বৃত্তি দিচ্ছেন। স্বামী ভূপানন্দ তাঁর পূর্বাশ্রমের স্নেহধন্যা কন্যা—যাঁর অকাল প্রয়াণ তাঁর জীবনে দিগ্‌দর্শন,—সেই কন্যার স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বর্ণ স্মৃতি স্কলারশিপে বার্ষিক ১২০ টাকা যে ছাত্র এই বিদ্যাপীঠে নবপ্রবর্তিত দ্বিবর্ষ শিক্ষাক্রমের একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করবে তাকে দিচ্ছেন। তাছাড়া

তিনি অকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণলীনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শস্বামীরা আশ্রমকন্যা সন্ন্যাসিনী উদ্বোধনাপুরীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১২০ টাকা মূল্যের আর একটি বৃত্তি একাদশ শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ও এই বিদ্যাপীঠে পাঠরত ছাত্রকে দিবার ঘোষণা করছেন।

এই বৎসর পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীদ্বয় এই বিদ্যাপীঠে না পড়ায় তাদের স্থলে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদ্বয়কে যথাক্রমে পুতুল-স্মৃতি স্কলারশিপ ও কবিসুহৃদ কুমুদরঞ্জন স্মৃতি স্কলারশিপ দেওয়া হোল। তাছাড়া বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের প্রথম দুইজন এই বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়ন না করায় পরবর্তীজনকে বর্ণাঢ্যস্মৃতি স্কলারশিপ দেওয়া হোল।"

শ্রীঅর্চনা মায়ের শ্রীহস্তে পুরস্কার গ্রহণ করে পরমানন্দে ফিরে গেল কৃতি ছাত্রের দল। পুরস্কারের সাথে শ্রীঠাকুরের পরম আশীর্বাদ তাদের মনে এনে দিল নোতুন প্রেরণা নোতুন উৎসাহ নোতুন উদ্যম। জয়তু সত্যানন্দ।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাপ্তি

—ডাঃ নবীনা বসু, এম ডি, এস আর এইচ এস, এম্. আর এইচ এ

ইচ্ছা লীলা আনন্দ—নিত্য ও অনন্ত। এক-এর মাঝেই তিন, ত্রয়ী, ত্রিগুণাতীত, চিন্ময়, সত্য-সমন্বয়। আবার, তিন-এর মধ্যেই এক, একক, একমেবাদ্বিতীয়ম্। মুগ্ধ-লোলিত স্বর্গ-হেলনা অঙ্গ গলিত যুগ-রচনা।

"হে মুনি অতীত! কথা কও, কথা কও—" বলেছেন ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ।

সেদিনের সেই সোনা-ঝরা সুখ-স্নাত প্রভাতন-উজ্জ্বল অনাদি অতীত আজ মূক মৃত, পত্র-লিখন পিঙ্গল, হয়তো বা হারিয়ে ফেলেছি তার স্বর্ণ-লিখন—পুরানো আঁখরগুলি অস্পষ্ট অস্পষ্টতর বুঝি বা। স্মৃতি আজ স্মৃতি মাত্র সার। তবু, আজও শুনি তার সে কী গম্ভীর বাণী: স্থাপত্য-শিল্পে, দেউল দেবালয়ে, বন-মর্মরে, নদীর কলতানে, সাগরের উর্মিমালায়, সুদূর নীহারিকায়—'তারায় তারাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা!' যে ঠিকানা জানে সেই হিরা মরমীয়া। সেই অক্ষরীর বিস্মরণের স্মরণিকার স্বর্ণ-কণা কথা ও কাহিনী:

গোলোক: নারায়ণ সমাসীন। দ্বারে দ্বারী—জয় ও বিজয়। মহর্ষি অষ্টবক্র দণ্ডায়মান, দর্শনপ্রার্থী নারায়ণের। দুর্জয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বলীয়ান দর্পী জয়-বিজয়। অপমান ব্যথা-বেদনা মর্মাহত মহর্ষি, চেতন প্রাণ-মন বিচ্ছেদ-ব্যাকুল; কণ্ঠে অগ্নি-বাণী: এতো দর্প···! নারায়ণ সান্নিধ্য গর্বে গরীয়ান তোমরা! বেশ, দ্বয় জন্ম লবে তোমরা ধরাতলে নারায়ণ অদর্শনে।

'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ঋষি' ভূলুণ্ঠিত জয়-বিজয় মহর্ষির পদতলে। মহর্ষি নীরব নিস্পন্দ! স-করুণ ক্রন্দনে ভিজে গেল মন, কহিল ব্রাহ্মণ: ঋষি-বাক্য মিথ্যা কভু নয়, ব্যর্থ নাহি হয়, মিত্র ভাবে লভিবে জন্ম জনম, বিপরীতে শত্রু ভাবে বরিবে তিন জনম।

যুগ: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। দ্বারী জয় বিজয়ের জন্মান্তর: হিরণ্যকশিপু—হিরণ্যাক্ষ, রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও কংশ-শিশুপাল এবং গোলোকাধীশ নারায়ণের মর্ত্যে অবতরণ: নৃসিংহ অবতার, রাম অবতার ও শ্রীকৃষ্ণ। বন্দিল বিশ্ব, প্রণমিল শ্রীচরণে:

আর্য: স্তব স্তুতি হোম আত্মাহুতি সামগানে প্রীত এসেছেন তিনি।

অনার্য : বল বীর্য তেজ দম্ভ শক্তি টলিয়েছে তার রত্ন সিংহাসন।

নরলোক : ভক্তের ভক্তি আর্তের আর্তি পীড়িতের ক্রন্দনে তাঁর ধরায় আগমন।

অসুরলোক : নিপীড়ন অত্যাচার ধর্ষণ লুণ্ঠন ধ্বংস টেনে নামিয়েছে তাকে এই ধরার ধূলিতে।

ঋষি-কবি : "এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে তুমি সুন্দর বেশে এসেছ! তোমায় করি গো নমস্কার।"

আধুনিক কবি : আমার এই তো "অহংকার।"

এই জেনেছি শুনেছি পড়েছি আঁধারে-আলোকে যুগ-যুগ ধরি বিরহ-মিলনে ভেবেছি মনে মনে—এই কী ধ্রুব, চির সত্য? তাই কী সব—? কোথায় কোন্ খানে মন যেন হার মানে। পরম অন্বেষণে হাহাকারে প্রাণ। ভক্তের ভজনে, আর্তের আর্তিতে, কবির সারগানে তিনি নামেন না। দানবের দাপটে, অনার্যের অত্যাচারে, অসুরের আস্ফালনে তিনি টলেন না আসেন না। কৃপাময়ের কৃপা-কণা আসে মাত্র সন্ধি-ক্ষণে ক্ষণ-সৃষ্টি সম!

সৃষ্টির আদিতে দেখি—"জল জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল!" তমসা ঘনঘোর। সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ তাই বাধা জর জর! জ্যোতির্ময় জ্যোতি জল জল!

ইচ্ছাময়, তবু ইচ্ছাধীন। অরূপ তিনি, স্বরূপ তিনি। স্ব-ইচ্ছায় স্ব-প্রকাশ তিনি।

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, এই দয়াহীন সংসারে।" এই সত্য, কবি গান : "সকলি তোমারি ইচ্ছা" ঋষি কবি গেয়েছেন : "তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।" আবারও : "নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।" এই-ই ধ্রুব সত্য।

আর্তি, অর্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, ধ্যানী, দুরাচার, নরাধম, মূঢ়, অজ্ঞান; কারও আবেদনে নিবেদনে, জ্ঞানে, ধ্যান-ধারণায় তিনি ধরা দেন না, নামেন না, নামতে পারেন না; কৃপা কৃপা করেন শুধু - কৃপা-কণা মাত্র! তাঁর ইচ্ছা পরম ইচ্ছা, আপন-ইচ্ছায় তিনি পরম প্রকাশ—নীল ও নীলিমার সীমা ও অসীমে অপূর্ব একা। মন-ইচ্ছা : "য একোঽবর্ণো বহুধা" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪।১)

সুনীল সাগরে অনন্ত সমুদ্রে শায়ীত বিরাট শিশু—ভাবঘন নিঃসীম একা, ধ্যান গম্ভীর-অন্তঃলীন। এমনি একা একা আর ভাল নাহি লাগে! আত্ম-প্রকাশে আপনি উন্মুখ—একটু খেলা করি! খেলা-খেলা খেলা করি বারেক আপন-ইচ্ছায় আনমনে। খেলার ইচ্ছায় অপার জলধি হোতে উত্থিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূত। অসীম পেল সীমা, সীমা-অসীমে মেশামেশি। জল হোতে ওঠা মাটি পেল রূপ, পেল আলো, পেল বায়ু। বিশ্ব পেল প্রাণ। ব্রহ্মাণ্ড হোল প্রাণময়! শব্দ-ব্রহ্ম হোল বাঙ্ময়, শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রথম শব্দ ওঁম! শ্রীকণ্ঠ উদ্‌গাত প্রথম গভীর বাণী : "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!"

ইচ্ছাময় এবে লীলাময়। ভুবন-মোহন-স্বপন-রূপ! রূপ ও অ-রূপে মিলে অপরূপ। ক্ষণ-চঞ্চল চিত্তে ক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বলতা—এ কী অপূর্ব অদ্ভুত! এই আমার সৃষ্টি! এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড! এই প্রাকৃতিক! এই পরমাপ্রকৃতি। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্!" (শ্রীশ্রীগীতা ৯/১০)—আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। "স ঈক্ষতলোকান্ নু সৃজা ইতি" (ঐতরেয় উপনিষদ্ ১।১

"হে বিরাট শিশু! কী খেলা খেলিছ বিশ্ব লয়ে আনমনে!"

সে-শিশু আর শিশু নয়।—"বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়! সে কী গো বিস্ময়!!"

নয় সে আনমন্। অন্তমন তন্‌মন সে বিরাট পুরুষ—সোঽহম্ পরমপুরুষ পরমব্রহ্ম।

সেই আমি—, এই আমি! এ সবই আমার ইচ্ছা! আমার লীলা!! আমার আনন্দ!!!

"অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥"

ইচ্ছাময়, লীলা-অভিরামে আনন্দমগন। চেতনময় জগতে চিন্ময় আনন্দ-স্বরূপ। আপন সৃষ্ট সৃষ্টির মহাবিশ্বের বিশ্বরূপ লীলা হেরি' লীলাময় বিস্ময়ে হতবাক, ভাবঘন অন্তর-মন :

"আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্ব-ভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান;
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

লীলাময়ের "লীলার যে তাঁর নাইক শেষ ধান-গম্ভীর ভাবময় লীলা-চকল :

"কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি ;
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।"

আনন্দময় আনন্দ-স্বরূপ আনন্দে মত্ত-প্রমত্ত। লীলাময় লীলা লাগি প্রেমঘন প্রেমময় :

"আরো প্রেমে আরো প্রেমে—,
মোর এই—আমি ডুবে যাক্ নেমে !"

ইচ্ছাময়ের আলোক-দীপ্ত ইচ্ছাখানি উথলি ওরজিছে,—গোলোক হ'তে ভূলোকে।

ইচ্ছা—অবতরণে গতিচ্ছা, অভীপ্সা ;—মানবলোকে মানবের সাথে সাথী হ'য়ে লীলা খেলা, খেলুরী হ'য়ে আনন্দ-খেলা।

দেবলোক হ'তে জ্যোতির্ময়ের মহানিক্রমণ : "আমি যাচ্ছি, তুমি এসো।"

সেই অনাদি অনন্ত অতীতের শ্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত স্মরণাতীত মহাবাণী : "সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সেই ইচ্ছা সেই লীলা - সেই আনন্দ, এক নিত্য ও অনন্ত।

সেই শ্রীরাম, সেই লক্ষণ : ভাইরে লক্ষ্মণ, তুমি যে আমা হোতে বড় !

সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই অর্জুন : সখা, তুমিও ছিলে, আমিও ছিলাম ; তুমিও আছ, আমিও আছি ; আবার, তুমিও থাকবে, আমিও থাকব।—"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ (শ্রীশ্রীগীতা ৯/৮)—আমি নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করে বারবার সৃষ্টি করি।

সেই শ্রীনিমাই চাঁদ সেই নিত্যানন্দ :—তা' ব'লে কী প্রেম দিব না !

আবারও, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই নরেন : আজ তোকে আমার সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে গেলাম।

শ্রীগদাধর তাঁর শ্রীশ্রীতবতারিণী মাকে নিবেদন অর্পণ করেছিলেন তাঁর ইহকাল পরকাল, সব, সবকিছু সর্বস্ব, শুধু তাঁর ইষ্ট বাদ—সত্য। বলেছিলেন : "আমি আবার আসবো—।" সেই সত্য-রক্ষার্থে এলেন, যদিও এবার বড় তাড়াতাড়ি, কাছাকাছি, মাত্র ১৬ বছরের ব্যবধানে ; তবু তিনি এলেন এবার সত্যব্রত হোয়ে—সেই-ই শ্রীসত্যানন্দ।

এই ভাবেই যুগ হোতে যুগান্তরে, কাল হোতে কালান্তরে, স্থান হোতে স্থানান্তরে, তাঁর চির চলাচল—স্বইচ্ছায়, আপন লীলায়, আনন্দ স্বরূপে। রূপের মাঝে অরূপরতন, সীমার মাঝে অসীম তিনি ; সেই "সম্ভবামি" সেই "বিসৃজামি", সেই "সোঽহম্"—সেই আমি।

"নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে ;
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

এই-ই চিরন্তন সত্য সনাতন সূর্য সম।

দেবলোকে নারায়ণ হ'ন নরলোকে নর-নারায়ণ। কেমন যেন হেথায় এক করুণাঘন আর্তি শুনি কণ্ঠে তাঁর :

'তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান !" (ক্রমশঃ)

পূজা সর্বোত্তম

অপরাজিতা ভাদুড়ী

ঊষারাগে আরক্তিম নীলাভ পূর্বাকাশ।
নীল সরোবরে যেন ফুটোন্মুখ রক্ত শতদল।
আলোছায়া হিল্লোলিত নানা রংএ
আহা সেকি বর্ণালী বিভাস !

গগন ও বসুধার মধুর মিতালি প্রেমে
পুলকে প্রকৃতি হাসে আনন্দে বিভোল।
বিকট কুসুম রাজির সৌরভে আকুল বনবীথি।
পুণ্য চয়নে তুমি সাথি হাতে এলে হে তাপস।

শুভ পূজা নেমে এল মৃত্তিকার পুষ্পিল মালঞ্চে,
পুলকের ছন্দাবেশে সবার অলক্ষে,
ধরিত্রীর দেবপূজা মঞ্চে।
পুষ্পিত কানন শোভা সাধকের চক্ষে আনে জল,
আনন্দে হৃদি টলমল।
দেবকণ্ঠে সমুদ্গীত মহা বেদবাণী।
আহা এই ক্ষুন্ন পুষ্পমালঞ্চ,
"এখানে তো পূজা হয়ে গেছে বিরাট,
পূজা হয়ে গেছে বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া॥"
সর্বোত্তম পূজা তুমি প্রভু
মার কাছে চাই শুধু নিবিড় সোহাগ।
আকুল সোহাগ রাঙ্গা সিঁদুরের রাগে।
নবারুণ রূপে নেমে এলে তুমি ফাল্গুনী দ্বিতীয়ার
অনুরাগ রাঙ্গা রাগে।
পূজা তুমি প্রভু, নিজে তুমি পূজা মার পায়ে
রাঙ্গা জবা, তুমি পূজা।
প্রকৃতি জানে সে পূজা পদ্ধতি শিখাময়ী দশভূজা।
অশোক, পলাশ, বকুল, করবী, মালতী, হাসনুহেনা।
দখিণা সমীরে কানাকানি করে উল্লাসে আখনা।
কেন কোকিলের কণ্ঠ সুধায় করে গীতি অবিরাম,
দ্বিতীয়ার চাঁদ শুক্লা নিশীথে মধু জোছনায়
গায় শুধু রাম নাম।
কে এসেছে ওগো, কে এসেছে বল, শুধায় ভ্রমর বধূ।
ব্যাকুল উতল সরোবর জল প্রতীক্ষা করে
শুভক্ষণের ক্ষণ দর্শন তবু।
তৃণে তৃণে পূজা প্রার্থনা আর নাম জপ করে মাটি,
গেরুয়া ধূলায় সোহাগ আঁচল বিছিয়ে,
পেতেছে কোমল শীতল পাটী।
আমার বাছা যে এই পথে যাবে কাঁকর যেন
না ফোটে গোপালের পায়,
রুনু-ঝুনু বাজে মণি মঞ্জীর ঐ বুঝি আসে,
ঐ বুঝি আসে, "হাসিক বনের" দ্বার।
ঐ হাসে চাঁদ চন্দ্রাকুটীরে শঙ্খ নিনাদে
বাজে মঙ্গল গীতি,
কে এসেছে ওগো, কে এসেছে বল, শুধায়
ব্যাকুলা বন মল্লিকা
আকাশে বকের পাঁতি।
উত্তর আসে, দখিণা বাতাসে, মাধবীলতার কুঞ্জে।
আমি পূজা ওগো ভাবময়ী পূজা কুসুম কাননে
ওসেছি পুষ্পপুঞ্জে।
জানো নাকি ফুল ঝরে পড়ে ঘাসে
কার দুটী রাঙ্গা পায়?
কেন কাঁদে জীব ভোগে অহরহ, কর্ম বিপাকে হায়।
জন্ম জন্ম ঘুরে মরে শুধু পাপের পঙ্ক জালে
ভোগ বাসনার বিপুল বিলাসে ডুবে থাকে মোহানলে।
তাই পৃথিবীতে এতো অশান্তি, এতো অসাম্য নীতি,
জানেনা মানুষ কোন্ পথ শুভ
কল্যাণতম ঈশ্বর নামে নেই সামান্য প্রীতি।
তাইতো মাটিতে দুর্গতি এতো এতো বঞ্চনা ব্যথা
ফুলের ফসলে উর্বরা মাটি অঙ্কুরে তাই বিষম বিষণ্ণতা।
এই শুভবোধ জাগ্রত হলে মানুষের মনে হবে
দেব অধিষ্ঠান,
শুধু কথা নয়, স্মরণে মননে, নাম কীর্ত্তনে
প্রতিষ্ঠা হবে তাঁর পূজা আরাধন।
সূর্যালোকের স্বর্ণ রশ্মি কত পবিত্র সুন্দর।
সেই যে ত্রিলোকে উজলিছে সদা মানুষের হৃদি কন্দর
অন্ধ মানুষ জানেনাকো হায় সে আলোর সন্ধান
তারই শুভ সংকেত এনেছে দিশারী আলো শুধু আলো
আনন্দ অনুদান॥
ফাগুন শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ
নেমে এল চুপে ধরণীর আঙ্গিনায়।
মায়ের সোহাগে স্নেহে ঢলোমল
যেন নদীয়ার গোরা রায়।
অমরাবতীর পূজা নেমে এল
বাসন্তিকার মধুকর সম্পুটে।
পূজা তুমি প্রভু সর্বোত্তম পূজা
শতাব্দীর সুতপ্ত ললাটে।

আশ্রম সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

গত ১৩ই ডিসেম্বর '৭৬, সোমবার, সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর ১২৪তম জন্মমহোৎসব শুচিস্নিগ্ধ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমার ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, আরতি, হোম, চণ্ডীপাঠ ও নামগান অনুষ্ঠিত হয়। পূজকের আসন অলঙ্কৃত করেন ঠাকুরের মানসকন্যা পূজনীয়া শ্রীঅর্চনা মা। ঠাকুরের সন্তান ডাঃ সুরথ চৌধুরী মহাশয় চণ্ডীপাঠ করেন। পূজান্তে বহু ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ খিচুড়ী প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। দরিদ্রদের মধ্যে কিছু নতুন চাদরও বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতীর শিল্পীবৃন্দের মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে দেবশিশু যিশুকোলে মেরী মাতার প্রতিকৃতিতে পূজারতি, বাইবেল পাঠ যিশুর উদ্দেশ্যে রচিত বন্দনা গান এবং শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে টফি, আশ্রমে তৈরী কেক ও কমলালেবু প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ভগবান যিশুর জন্মদিন পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত যদুলাল মল্লিকের বংশধর সুসাহিত্যিক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীও উপস্থিত থাকায় ভক্তগণ বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করেন।

১লা জানুয়ারী কল্পতরু দিবস উপলক্ষে সকালে আশ্রম মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, স্বামী নীলানন্দ মহারাজ কর্তৃক হোমানুষ্ঠান, নাম গান এবং পূর্ণাহুতির পর ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জয়দেব কেন্দুলি

জয়দেব আশ্রমে গত ১৩ই জানুয়ারী '৭৭ (২৯শে পৌষ) সদ্গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। এদিন সকালে সত্যানন্দ মন্দিরের নবনির্মিত তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটন করেন দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষ সেবক স্বামী ভূপানন্দ মহারাজ। এই সঙ্গে মন্দির প্রকোষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদা মার দুটি মর্মর মূর্তিও সমবেত ভক্তকণ্ঠে উচ্চঃস্বরে নামকীর্তন যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদা মা ও শ্রীগঙ্গামার বিশেষ পূজা, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, হোমআদি অনুষ্ঠানগুলিও দিব্য ভাবমণ্ডিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩. ১ ৭৭ তারিখ পর্যন্ত চার দিনের উৎসবে প্রতিদিন রাত্রে কীর্তন, বাউলগান, নামগান সমাগত ভক্তবৃন্দকে ভক্তিভাবে আপ্লুত করে তোলে। চারদিনে কমপক্ষে প্রায় চার হাজার ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ আশ্রমে তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেয়েছেন। উৎসবকে সফলসুন্দর করার জন্য আশ্রম শীর্ষ সেবক স্বামী গৌরানন্দ মহারাজের প্রাণপণ প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে অন্যান্য স্থান থেকে ঠাকুরের যেসব সাধু ও ভক্ত সন্তানগণ ছুটে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিউড়ী আশ্রমের স্বামী সুরেশ্বরানন্দ মহারাজ, দুবরাজপুরের শ্রীসুধীর পাল এবং রাধা কিঙ্করানন্দও ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, বরানগর

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৪২ তম আবির্ভাব স্মরণে সেবায়তনে গত ২০-২১শে ফেব্রুয়ারী '৭৭ দুদিন ব্যাপী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, আরতি, চণ্ডীপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ ও পূজান্তে ভক্ত দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদ নিয়ে সুসাহিত্যিক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের মনোজ্ঞ আলোচনার পর আশ্রমের সাধু ও ভক্তগণ রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ঠাকুর সত্যানন্দদেব রচিত "দরদী ঠাকুর" গীতি আলেখ্যটি পরিবেশন করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় স্বামীজীর "মায়ের খেলা" সম্প্রদায় কর্তৃক "সারদা লীলাকীর্তন" শ্রোতাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

গঙ্গা দুলালী

(নাটক)

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

১ম দৃশ্য

[কাশী মণিকর্ণিকার ঘাট—ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন —একপার্শ্বে শ্মশান - মড়া পুড়িতেছে—ঠাকুরের নৌকা ভিড়িল।]

ঠাকুর—কাশী স্বর্গময় কাশী—জীবের মোক্ষক্ষেত্র। আহা দেবাদিদেব মহাদেব মা অন্নপূর্ণা এখানে নিত্য-বিরাজ করছেন। মা মা মা গো। (অর্দ্ধভাবে)

মধুর—দেখ দুনু, ছোট ঠাকুরের দিকে একটু নজর রেখো। বাবা আমার নিত্য ভাবে ভোলা, বিশেষ করে তীর্থ দর্শনে এসে থেকে বাবার যে রকম সমাধিমুখী অবস্থা দেখছি তাতে ছোট ছেলের মত করে তাঁকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে এই ভরা গঙ্গায়।

দুনু—ওহে মাঝি একটু হুঁশিয়ার হয়ে চল বাবা।

(দূরে শিবদর্শন ও মাতৃদর্শন। মা বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন ও শিব কর্ণমূলে নাম দিতেছেন। ঠাকুর টলিতে টলিতে ছুটিলেন।)

সকলে—ধর ধর।

ঠাকুর—জয় শিব! জয় শিব! মা মা গো।

(সমাধিস্থ দর্শন মিলাইয়া গেল)

দুনু—মামা, মামা গো, চোখ চাওনা গো। ওগো এখুনি যে পড়ে যেতে। মামা ও মামা!

মধুর—কে সাড়া দেবে দুনু, বাবার মন কি এ লোকে আছে। আর বাবার নিশ্চয় কোন বিশেষ দর্শন হয়েছে, তাই অমন করে ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন। তুমি নাম শোনাও। দেখি, নাম ভিন্ন কি নামীকে টলানো যায়। নাও আমরা সবাই নাম করি।

(নাম করিতে লাগিল)

ঠাকুর—শিব শিব মা মা জগৎ জননী গো। তুমিই মুক্তি তুমিই বন্ধন মা! শরণাগত শরণাগত! বাপু আর একটু মার নাম কর তবে আমি ভাল হবো।

(পুনরায় নাম চলিতে লাগিলো)

ঠাকুর—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) হাঁ গা আমি কি খুব বেশী কিছু করে ফেলেছিলাম?

মধুর—না বাবা কিছু ভেব না। এখন আস্তে আস্তে নেমে চল বাবা—এইখানেই স্নানাদি করে মন্দিরে যাব।

(সকলে নামিলেন

ঠাকুর—কি দেখলুম জান—দেখলুম, পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর চরণে শ্মশানে চিতার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন আর প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে তুলে তার কানে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দান করছেন। সর্বশক্তিময়ী শ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অন্তন্যাশে তার ভুল, দ্বন্দ্ব কারণ এই সমস্ত সংস্কার বন্ধন খুলে দিচ্ছেন আর নির্বাণের দ্বার খুলে তাকে অখণ্ডের ঘরে পাঠাচ্ছেন।

মধুর—তুমি ঠিকই দেখেছ বাবা—শুনেছি কাশীর মৃত্যু মৃত্যু নয়, মুক্তি! তোমার এই দর্শনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল।

জনৈক পণ্ডিত—কি আশ্চর্য বাবা, কাশী খণ্ডে মোটামুটিভাবে লেখা আছে, এখানে মৃত্যু হলে বিশ্বনাথ জীবকে নির্বাণ পদবী দিয়ে থাকেন—কিন্তু কিভাবে যে দেন তা বিস্তারিতভাবে লেখা নাই। আপনার দর্শনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেমন করে ঐ ব্যাপার ঘটে থাকে। প্রভু আপনার দর্শন যে শাস্ত্র লিখিত বাণীরও পারে চলে গেছে। আপনি কে প্রভু! আপনার দর্শনে আমরা ধন্য—বারানসী ধন্য—আমাদের শত শত প্রণাম গ্রহণ করুন।

মধুর—চল বাবা আমাদের আবার মন্দিরে যেতে হবে।

। সকলে—জয় বাবা বিশ্বনাথ ! জয় মা বিশ্বেশ্বরী।

নেপথ্যে কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল

—ড্রপসিন—

২য় দৃশ্য

[কাশী—ত্রৈলঙ্গ স্বামী বালির উপর শুইয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর, মধুর ও হুদুর প্রবেশ।]

মধুর—বাবা, ইনিই কাশীর মহাপুরুষ শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী। কাশীর সব বিখ্যাত সাধুদের মধ্যে ইনি প্রধান। স্বামীজী আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

(প্রণাম)

ঠাকুর—এ যে দেখছি সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ এঁর শরীর আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে আছেন। এঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। খুব উচু জ্ঞানের অবস্থা। দেখছ না, শরীরের কোন ধর্মই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য, সেই বালির ওপরেই সুখে শুয়ে আছেন।

হুদু—আচ্ছা মামা, দু একটি প্রশ্ন করো না—

মধুর—না হুদু, ইনি এখন কথা কইবেন না—মৌন হয়ে আছেন কিনা।

ঠাকুর—আহা সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ! ওরে হুদু দেখছিস, একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে। এ অবস্থা কি সহজে লাভ হয় রে।

মধুর—আর এ অবস্থায় দেহ রাখাও ত' মুস্কিল, সে কথা তো তোমারই মুখে শুনেছি বাবা।

ঠাকুর হ্যাঁ, আধিকারিক পুরুষ বা অবতার পুরুষ ভিন্ন এ অবস্থায় বেশী দিন শরীর থাকেনা—শুকনো পাতার মত শরীরটা ঝরে পড়ে যায়।

মধুর—উঃ কি অবস্থা ! একেবারে দেহজ্ঞান বিরহিত অবস্থা—যেন সাক্ষাৎ যোগীরাজ মহাদেব নিত্য ধ্যানরত আর এঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনাও শুনেছি।

ঠাকুর—তা হ্যাগা সেজবাবু, কিছু খাবার এনেছ তো ? এঁকে খাওয়ালে সাক্ষাৎ কাশীর বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করা হবে।

মধুর - হ্যাঁ বাবা সে কথা খুবই সত্য। আমি কিছু পায়েস করিয়ে এনেছি।

(ত্রৈলঙ্গ স্বামী নস্যির কৌটা আগাইয়া দিলেন)

ঠাকুর—(হাসিয়া) আপনি কিছু মনে করোনা। ও তো আমার নেওয়া হ'বেনি।

(ত্রৈলঙ্গ স্বামী কৌটা ফিরাইয়া লইলেন)

ঠাকুর—আচ্ছা জী, ঈশ্বর এক, না অনেক ?

(ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইসারায় উত্তর দিলেন

মধুর—বাবা তুমি আমাদের বুঝিয়ে বল, আমরা ত' বুঝতে পারলুম না—

ঠাকুর—ওগো জান ইনি বলছেন—সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক, নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীবজগৎ এইসব নানাজ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক।

মধুর—এতো মহাজ্ঞানের কথা—তুমি সত্যিই বলেছ বাবা, কাশীর বিশ্বনাথকে মূর্তরূপে দর্শন করতে হলে এই মহাপুরুষকে দর্শন করলেই হবে।

এই নাও বাবা পায়েস এনেছি তুমিই খাও।

(ঠাকুর পায়েস ধরিয়ে দিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী গ্রহণ করিলেন।)

ত্রৈলঙ্গ স্বামী—ইসারা করিয়া হুদুকে মাটি কাটিয়া দিতে বলিলেন।

ঠাকুর—ওরে হুদু, ইনি এক কোদাল মাটি কেটে দিতে বলছেন, তোর পুণ্য হবে তাই বলছেন।

(হুদু মাটি কাটিয়া দিল)

মধুর—আহা আজ আমার মহাশুভদিন—একদিকে জগৎগুরু যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, অপরদিকে শিবস্বরূপ শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী—এই মহামিলনের সাগর সঙ্গমে আজ আমি মহাতীর্থ বারিতে স্নান করে ধন্য হলাম। চল বাবা—

(প্রণাম ও প্রস্থান

—ড্রপসিন—

৩য় দৃশ্য

[নিধুবন গঙ্গামায়ীর কুটীর। গঙ্গামায়ী পূজা করিতেছেন।]

গীত

গঙ্গা— হায় ইতনা দের ন কর দুলারী
গঙ্গাকে কুঞ্জ সুহায়ে যা
গঙ্গাকে দুখ ভুলায়ে যা
নীল যমুনা রোরে পুকারে
মনহারিন আযা রে
প্রেম গাগরী ভরলে
ফির কৃষ্ণ প্রীত মচায়ে যা ॥

গঙ্গা—এত করে তোকে ডাকছি তবু কি তুই আসবিনা দুলালী? আমার শেষের দিন যে ঘনিয়ে এল। আবার কবে তেমনি করে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে বেজে উঠবে শ্যামলের মোহন বেণু আর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী তুই ছুটে যাবি শ্যাম অভিসারে। আর কতদিন বল দুলালী? আর আমি কি করবো জানিস্? মনের মত করে তোকে সাজিয়ে দোব। এই তো সেই নিধুবন, সেই সবই রয়েছে কিন্তু কোথায় তুই, কোথায় আমার নন্দ কিশোর। (ব্রজ কুমারীদের প্রবেশ)

সকলে—ও গঙ্গা মা, এই দেখ তোমার দুলালীর জন্য, তোমার শ্যামলের জন্য আজ আমরা কত কি এনেছি।

গঙ্গা—তোরা ত' রোজই আনিস্ মাঈ।

১ম—আজ আমি অনেক ফুল পেয়েছি, আর কত সুন্দর সুন্দর।

২য়—আর আমি এনেছি ঘরের তৈরী ক্ষীর মাখন দই।

৩য়—আমি দুধ আর মোয়া এনেছি গঙ্গা মা।

গঙ্গা (৪র্থকে)—আর তুই কি এনেছিস লালী?

৪র্থ—বনফুলের মালা এনেছি। তোমার ঠাকুরকে, তোমার দুলালীকে পরিয়ে দাও। কেমন মানাবে।

(মালা দিল)

গঙ্গা—আহা বেশ মালা। তোরাই যে আমার সেই বৃজ-দুলারী। বস মা বস্।

(সকলে বসিল। গঙ্গা মা তাহাদের আনীত দ্রব্যে সাজাইতে ও ভোগ দিতে লাগিলেন।)

১ম—আচ্ছা গঙ্গা মা, তোমার দুলালী তোমার সঙ্গে কথা বলে?

২য়—তুই কি বোকা রে, জানিস না, গঙ্গা মা যে দুলালীর সখী। ললিতা সখী বুঝি তার সই এর সঙ্গে কথা বলে না?—ঠিক না গঙ্গা মা?

গঙ্গা—(হাসিয়া) তোরা যা বলিস মা—আমি যে কি, কিছুই জানিনা, তবে এই আশা নিয়ে পড়ে আছি যদি আমার রাধা দুলালী আমার শ্যাম দুলাল কোনদিন আসে। ক্ষণিক দেখায় ত' বুক ভরে না মা, আমি যে চাই এই চোখে দেখতে, এই হাত দিয়ে সেবা করতে; এই বুক ভরে তাকে পেতে। আমার মনে হয় কি জানিস্ একবার যদি আমার শ্যাম আমার দুলালী আসে তাহলে আর ছেড়ে দেব না। এই নিধুবনেই ধরে রেখে দেব। আর তোরা আসবি তাকে গান শোনাতে, তাকে ঘিরে নাচবি, ধুম মাচাবি।

সকলে—কি মজাই না হবে তাহলে; আমরাও, গঙ্গা মা, কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেব না, আসুকনা আমরা জোর আগলে থাকব।

গঙ্গা—তা তোরা জোর আগলাতে পারবি। আচ্ছা সে এলে কি বলে তোরা আটকাবি বল্ দেখি?

১ম—শুনবে গঙ্গা মা—(সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল)

(নৃত্য ও গীত)

মৈ বৃজকী দুলারী তু রহযা
মৈ ন খোলু দুখকা দরবাযা ॥
দেখ রোয়ে বৃজকে বন
রোয়ে সাওরে তন
সব রোনা ধোনা ধোই
রূপকী চকমক ছা যা ॥

—ড্রপসিন—

৸র্থ দৃশ্য

[বৃন্দাবনের পথ
ছোট ছোট মেয়েরা নাচিতেছে।]

(গীত)

মেরে মোহনকে পগপগমে
দিলে রগরগ
রোম রোমপে জলে
প্রেম দিব্‌ড়া জগমগ।
আও মেরী উমঙ্গকে ওর নহীরে
মেরে দুখ কঁহীরে
নৈনমে প্রীতমকে রূপ চকমক।

সাঁহলীকে মুরলীমে
আনোখা সুর
হোয় জীবন ভরপুর
হোয় মরণ ভরপুর
বিরহন কি বিথা আজ
দূর চলে রে
গদাধরকে চরণমে
জী ডোলে রে
কিসমৎকে নৈয়া আজ
ডোলে ডগমগ।

। ঠাকুর ভাবে টলমল করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছেন পিছনে ভদু ও মধুর।)

ঠাকুর—হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
সখী সে বন কত দূর যেখানে আমার শ্যাম সুন্দর।
ঐত কৃষ্ণ গন্ধ পাই।

মধুর—দেখছ ভদু, বৃন্দাবনে এসে বাবার অবস্থার কি অদ্ভুত পরিবর্তন! ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণলীলার স্মরণে বিহ্বল হয়ে পড়ছেন। আমার মনে হচ্ছে জান— যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ আবার দেহ ধারণ করে এসেছেন। আবার মনে হচ্ছে যেন বিরহ ব্যাকুলা স্বয়ং রাধারাণী, এমন মহাভাব মূর্তি আমি সত্যি বলছি ভদু কখনও দেখিনি। অবতার ভিন্ন এ ভাব ধারণ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠাকুর—(কাঁদিতে কাঁদিতে) সেই যমুনার তীর, সেই ব্রজ বিপিন, সেই ময়ূর ময়ূরী—কৃষ্ণরে সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

মধুর— আহা কি অবস্থা! চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বাবা চল, বিহারীজীর মন্দিরে যাবে না।

ঠাকুর—কৃষ্ণরে আমি তোকে না পেলে প্রাণে যে বাঁচব না! হ্যাঁরে এমন করে কি লুকিয়ে থাকে—ওগো হয় তোরা আমায় নিয়ে চল না হয় তাকে এনে দে। আমার কানু অনুগত তবু কানু ছাড়া করো না।

মধুর—চল বাবা তোমায় কৃষ্ণের কাছেই নিয়ে যাই।

(পট পরিবর্তন)

(বাঁকে বিহারীর মন্দির)

(পুরোহিত আরতি করিতেছে—বালিকারা নিত্যলীত রত।)

চমকে চকমক জ্যোতকে দিব্‌ড়া
আরতি নন্দনন্দনকে
শাঁখকে সহনাই বজ উঠে রে
দূর গগণকে অঙ্গনমে।
আওরে নৈ বৃজকে বাসী
আওরে ভক্ত লগনকে প্যাসী
লাও লাও প্রেম চন্দন রে।
দেখো সুন্দর মুরতি
বাঁকে বিহারী
শ্যাম মুরারী
খোল খোল ভববন্ধন রে।

। ঠাকুরের উন্মত্তের ন্যায় প্রবেশ)

ঠাকুর—ঐ ঐ আমার কৃষ্ণ, ঐ আমার কৃষ্ণ, ঐ ঐ যে বাঙ্কবী দূরে দাঁড়িয়ে—যাই যাই প্রভু…

(বিহারীজীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। সকলে ধর ধর শব্দে ছুটিয়া আসিল ও ঠাকুরকে ধরিল। ঠাকুর মূর্ছিত।)

(মধুর ও ছদুর প্রবেশ)

ছদু—ছেড়ে দাও, তোমরা আমার মামাকে ছেড়ে দাও।

(সকলে ছাড়িয়া দিল, মধুর ও ছদু ধরিল)

মধুর—বাবা, একটু উঠে বসো দেখি।

ছদু—মামা ও মামা, মামা গো, চোখ চাওনা গো।

ঠাকুর—(উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ছদুরে আমি তোকে কোলে করবো, বলবো নে রে বাপ, ধারে বাপ, ছদুরে কোলে আয়।

(সকলের দিকে চাহিয়া)

ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরি বল।—

হরি যে তোদের ডাকে আবার দেখা দেবে ধরা দেবে।

পুরোহিত—এই অদ্ভুত প্রেমী মহাপুরুষ কে বাবা? সাধারণ মানুষের মাঝে এ ভাব তো চোখে পড়ে না।

মধুর—আপনার ধারণা সত্যি ঠাকুর মশায়, ইনি এক অদ্ভুত পুরুষ, নিশিদিন প্রেমে মাতোয়ারা হয়েই থাকেন।

ছদু—বিশেষ করে তীর্থ করতে এসে থেকে মামার এ অবস্থা বেড়েই চলছে।

পুরোহিত—আহা কি রূপ! সেই একদিন এসেছিল এক প্রেমের পাগল। ধারে ধারে বিলিয়ে গেছে কৃষ্ণ প্রেম, আর বিকিয়ে গেছে আপনাকে। রাধা রূপে অশ্রু চেকে তিনিই এসেছিলেন, আজ আবার কি তিনিই ফিরে এলেন।

মধুর—(স্বগতঃ) এ অহমান সত্য। আমি ধন্য এঁর সেবা করার অধিকার পেয়ে।

(ঠাকুর সহসা উঠিয়া গান ধরিলেন)

গান

আমি বৃন্দাবনের বনে বনে
বেণু বাজাব
কেশব কত লুকোচুরি
খেলু চরাব।
খেলতে বড় ভালবাসি
খেয়ে খেয়ে তাইত আসি
মনের মত খেলার সাথী
কতই না পাব।

—ঢুলিয়া—

পঞ্চম দৃশ্য

[গঙ্গা মা গাহিতেছেন]

গান

মেরে সুন্দর প্যারে শ্যাম মুরারী
আও আও চিত চুরন মে
আও আও মেরে রাধা দুলারী
নয়ন ভুলাওন চিতবন রে।
রোরে নিধুবন
রোরে যমুনা
রোরে গঙ্গাকে নয়ন রে।

(বালিকাদের প্রবেশ)

১ম বালিকা—ও গঙ্গা মা, শুনেছ? কি সুন্দর এক ঠাকুর এসেছে, কি তার রূপ! প্রেমে নাচে হাসে···

২য় বালিকা—তোমার মত না তার ভাব হয় গঙ্গা মা, তবে তোমার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী।

৩য় বালিকা—আর কি কাঁদে। কাপড় ভিজে যায়।

৪র্থ—যাকে বিহারীকে ধরিয়ে ধরতে গিয়েছিল গো। আমাদের ভারি ভাল লেগেছে গঙ্গা মা।—

গঙ্গা আহা কার বাছা রে! কোথায় আছে বলতে পারিস? আমি কি দেখতে পাব না?

১ম—কেন পাবে না গঙ্গা মা, তিনি ঠিক তোমার কাছে আসবেন।

(ছদুর প্রবেশ)

ছদু—এইটিই কি গঙ্গা মাঈর কুটীর?

গঙ্গা—হ্যাঁ বাবা—

ছদু—আপনিই কি গঙ্গা মা?

গঙ্গা—হ্যাঁ বাবা, আমাকে এখানে সকলে ঐ নামেই ডাকে।

ছদু—আমার মামা এসেছেন, আপনার নাম শুনে। তিনি ভগবানের নামে একেবারে পাগল।—

গঙ্গা—তিনি কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? যাও যাও বাবা নিয়ে এস।

(ছদুর প্রস্থান ও ঠাকুরকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

৪র্থ—ও গঙ্গা মা, এই সেই সুন্দর ঠাকুর।

১ম—এই চুপ।—

ঠাকুর—মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন।

গঙ্গা—(স্বগতঃ) আহা ইনি কে? এমন ভাবে ঢল ঢল রূপ তো আমি দেখিনি। (প্রকাশ্যে) তুমি কে বাবা?

ঠাকুর—তোমার নাম শুনে তোমায় দেখতে খুব ইচ্ছে হল তাই চলে এলুম।—

গঙ্গা—তা বেশ করেছ বাবা, আমিও তোমার দর্শন পেয়ে ধন্য হলুম।—

ঠাকুর—তা তুমি তো প্রেমসিদ্ধা গোপী গো।

গঙ্গা—কি জানি বাবা, আমি তো কিছুই বুঝি না। তুমি আশীর্বাদ কর যেন প্রেম ভক্তি লাভ হয়।—

ঠাকুর—সত্যি বলছি আমি তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রজের গোপী দেখছি, আহা গোপীদের কেন অবস্থা। কি আশ্চর্য প্রেমোন্মাদ অবস্থা তাদের! এত প্রেম পাছে কৃষ্ণের পায়ে কিছু আঘাত লাগে তাই তাদের সূক্ষ্ম দেহ কৃষ্ণের চরণ তলে বিছানো থাকতো।—

গঙ্গা—আহা সে অবস্থা কি আমার হবে বাবা?—

ঠাকুর—তুমি তো হয়েই আছ গো। শোন একটা গোপী ভাবের গান শোন।—

(গীত)

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান
ব্রজ কে কিশোর সই
কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজ জন টুটল পরান
আগ নাহি বুঝনু
রূপ দেখি ভুলনু
সার কইনু চরণ যুগল
যমুনা সলিলে
অব তনু ভাসব
আন সখী ভখিব গরল
কিবা কানন বল্লরী
গলে বেড়ী বাঁধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নামও জপই
ছাড়তনু করব বিনাশ

(সমাধিস্থ)

গঙ্গা—এ কে গো! এ যে আমার দুলালী। না হলে এত ভাব এত প্রেম কে ধরতে পারে? আহা সেই কাঁচা সোনার বরণ কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী দুলালী, আমার দুলালী! (ঠাকুরকে ধরিল) একি চুপ করে আছিস কেন? হাঁগো এতদিন পরে এলি, আজ কি চুপ করে থাকা সাজে? আমার বুকে যে কত কথা জমা আছে রে। দুলারী আমার রাধা দুলালী।

ঠাকুর—আপনি ব্যস্ত হবেন না মা, আমি নাম করি তাহলেই আমার হুঁস হবে।

(ঠাকুর নাম শোনাইতে লাগিল হরিবোল ইত্যাদি)

ঠাকুর—হরিবোল হরিবোল হরিনর হরিবোল। চিন্ময় শ্যাম চিন্ময় ঠাম চিন্ময় ধাম। তুমিই আমি, আমিই তুমি।

গঙ্গা—দুলালী আমার দুলালী।

ঠাকুর—(ভাবে) দেনা সো কিছু খেতে

গঙ্গা—খাবি দুলালী? (খাবার দিয়া) এই নে খা

(খাওয়াইতে লাগিল)।

উঃ কত কেঁদে ডেকেছি, কত সেধেছি, তাই তো ধরা করে আমায় ধরা দিতে তুই আপনি ছুটে এলি।

ঠাকুর—হ্যাঁ গা আমি তো খাচ্ছি, এরা সব খাবেক নি? আহা সব সাক্ষাৎ ব্রজগোপী।

গঙ্গা—হ্যাঁ হ্যাঁ খাবে বই কি। কই রে তোরা যে বলেছিলি আমার দুলালী এলে নেচে গেয়ে তাকে আনন্দ দিবি। এই তো আমার দুলালী এসেছে, আমার ত্রিভুবন আনন্দে ভরে উঠেছে। নে নে তোরাও আনন্দ কর।—

(সকলে নাচিয়া গাহিতে লাগিল)

(গীত)

এ গঙ্গা মাই রে
তেরী রাধা দুলালী আইরে
অব তো উদাসী
পঞ্চবটকে প্যাসী

তেরে বৃজকো ভুল যাইরে।
কির বসালে নেহকে ডেরা
বাঁধ পঞ্চবটকে ছেড়া
সুন্দর লালী—জ্যোতকুঁয়ারী
রূপসে মন লুভাঈরে॥

—ড্রপসিন—

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(বৃন্দাবনের পথ। অদূরে গোবর্ধন পাহাড়—ঠাকুর, মধুর ও হৃদয় প্রবেশ করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে টলমল। সঙ্গে পাণ্ডা।)

ঠাকুর—কোথায় হরি, হে গোপীজনবল্লভ, হে লজ্জা নিবারণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।—আমি যে আর চলতে পারি না।

মধুর—সাবধানে নিয়ে চল হৃদু। আর আমরা এসে পড়েছি। ঐ দেখ গোবর্ধন পাহাড়। এইটুকু হেঁটেই যেতে পারব। পাণ্ডা ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে, আবার ফিরে যাবার সময় ত' বাবাকে নিয়ে যেতে হবে। চল আস্তে আস্তে নিয়ে চল।

হৃদু—(স্বগতঃ) যা ভাবে টলছেন, আজ আবার কি করে বসেন দেখি।

(প্রকাশ্যে) মামা ও মামা একটু হুঁসে চল।

(সকলে গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর গান ধরিলেন।)

(গীত)

ও ভাই ব্রজের কানু
নবীন ব্রজে ফিরলি কি ভাই
কোন চাঁদের সুধায় ঢলমলে
কালো আজ হলি আলো
কি রূপ মরি মরি
রাখিতে কোথারে ঠাঁই॥
আজ তেমনি করে গোঠের গোপাল
নাচ দেখিরে ওরে রাখাল
তোর রূপের কাজল নয়নে আজ
কিসে ভুলাই॥ (সমাধিস্থ)

মধুর—(স্বগতঃ) জানি না কি তপস্যার ফলে আজ এই আপন ভোলা ঠাকুরের সঙ্গ পেয়েছি। তীর্থযাত্রা ত' সবাই করে। কিন্তু আমার মত ভাগ্য কার। এঁর চরণের স্পর্শে তীর্থ আজ মহাতীর্থ হয়ে গেছে। এই ধূলিতে গড়াগড়ি দিলে এই ধূলার দেহ বোধ হয় সোনা হয়ে যাবে।

(রাখাল বালকদের প্রবেশ নাচিতে নাচিতে)

ঠাকুর—দেখ দেখ, সব সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। সাক্ষাৎ ব্রজের গোপাল। (ভাবস্থ হইয়া দেখিতেছেন)

(রাখাল বালকের গীত)

আরে মধুবটকে এক বাররে ঠাকুর
আনোখী লীলাসে দুনিয়া ভরপুর
দুখিয়া ভরপুর
বিন বাঁশীয়াকী ধুন
প্রেমী মনকো লুভায়
বিন নূপুর ঝমঝুম
হর কুঞ্জ সুহায়
এ বড়ে চতুর।
আধখিলে নৈনকে
অলখ ইসার
তনমনমে লাগে ফাগুনকে প্যার
এক ঝলক দরশন ত' লগায় আগন
কিসকৌসকে অমৃত হো যায় রে ধুর॥

(সকলে চলিয়া যাইতে লাগিল, ঠাকুর সহসা তাহাদের পশ্চাতে ছুটিলেন)

ঠাকুর—কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই আমার কৃষ্ণ কই! ওগো বল বল আমার কৃষ্ণ কই?

(হৃদু ধরিল, ঠাকুর সমাধিস্থ)

হৃদু—আঃ মামা, আবার এইখানে ঐ রকমটা সুরু করলে, আমি তখনই বুঝেছিলুম। চলুন সেজবাবু, এবার ফিরে যাই।

মধুর—তুমি নাম কর হৃদু। বাবা তো বেহুঁস হয়ে পড়েছেন, নিয়ে যাবে কেমন করে?

(হৃদু নাম করিতে লাগিল)

ঠাকুর—সব কৃষ্ণময়—সব কৃষ্ণময়—দেখ-দেখ, মাঠঘাট, ফুল-ফল, আকাশ সব কৃষ্ণময়। ঐত আমার কৃষ্ণ, ঐত আমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রে—

(ছুটিয়া গোবর্ধন পাহাড়ে উঠিলেন ও সমাধিস্থ)

ফল্গু—সর্বনাশ হল, সর্বনাশ হল, ওগো পাণ্ডা ঠাকুর, ধর ধর।

(সকলে ধরিয়া নামাইলেন)

মথুর—বাবা এইবার ফিরে চল। তোমার ত' এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি, বেলা হয়েছে যে।

(গঙ্গামায়ীর দুলালী দুলালী করিতে প্রবেশ)

গঙ্গা—দুলালী তুই এইখানে? এখনও যেলিনা? আমি যে খুঁজতে এলুম; বেলা যে অনেক হয়েছে, তোর কি খিদেও পায়নি? আচ্ছা তোমরাই বা কেমন? এখনও দাড়িয়ে আছ? চল্ দুলালী চল্।

ঠাকুর—চ না গো চ না, মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ দেহ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

মথুর—আপনিই কি গঙ্গা মাঈ?

গঙ্গা—হ্যাঁ বাবা, আর এই যে আমার দুলালী—

মথুর—প্রেমের ঠাকুর তুমি, তাই বুঝি তোমার এত প্রিয়। বুঝেছি কেন তোমার বৃন্দাবনের প্রতি এত আকর্ষণ।

(সকলের প্রস্থান)

(রাখাল বালকের প্রবেশ ও)

গীত

বড়ে চঞ্চল চোর মেরে শ্যাম রে
গদাধর রাখো নাম রে
চরণকো চাহি মরণ ত' মিলে
জলে বিনা দিন যায় রে॥
মন যে আগ লগায়ে
মজেসে দূর সে মুস্কায়ে
থকো বন বনায়ে
চিত্তকে মোহন ঠাম রে॥
দিল লেকে ছুপনা উনকী রীত
হোয় কী বেহাল তবসে প্রীত
নটখটকে রে কা কাম রে॥

—তুলসিন—

৭ম দৃশ্য

[গঙ্গামায়ীর কুটীর। গঙ্গামায়ী ও ঠাকুর বসিয়া আছেন।]

ঠাকুর—দেখ প্রেমই সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি। এই প্রেমে বাঁধা পড়লে আর তিনি পালাতে পারেন না। গোপীদের হয়েছিল, তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ।

গঙ্গা—আচ্ছা দুলালী, কি রকম প্রেম হলে তিনি চিরদিনের মত ধরা পড়েন? তার লক্ষণ কি?

ঠাকুর—প্রেমের দু'টী লক্ষণ। প্রথম জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।

দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না; দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।

গঙ্গা—এই প্রেম কি সকলের হয়?

ঠাকুর—প্রেম কি সামান্য জিনিস গা, চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। আহা এই প্রেমের এক কণা যদি কেউ পায় ধন্য সে। আহা গোপীদের কি অনুরাগ—তারা অক্রুর আসবার পর শ্রীমতীকে বললে রাধা তোর সর্বস্ব ধন হরে নিতে এসেছে, আহা কি ভাব 'সর্বস্ব ধন।' শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁকে শুকিয়ে যেত।

ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা এই ভালবাসা এই প্রেম-ভক্তিই বস্তু, আর সব অবস্তু।

গঙ্গা—দুলালী তোর কথা ত' নয় যেন অমৃত! তোর কথা শুনতে শুনতে আমার ত' সব হারিয়ে যায়।

ঠাকুর—কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসতে হবে তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। (ছোট ছোট মেয়েরা গঙ্গা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল)

গঙ্গা—ঐ দেখ তোমার ছোট ভক্তগুলি এসে পড়েছে।

ঠাকুর—আয় গো সব আয়।—

১ম বাঃ—গঙ্গা মা আজ তোমার দুলালীকে নিয়ে আমরা আনন্দ করব, সাজাব।

২য় বাঃ—আজ কিন্তু একলা আমরাই সাজাব। দেখ খুব ভাল করে সাজিয়ে দেব। তুমি ত' রোজই সাজাও গঙ্গা মা।

গঙ্গা—তা বেশ ত' মা দাজা না।

৩য় বা:—তুমি চুপ করে বসে দেখ।

৪র্থ বা:—ও গঙ্গা মা'র দুলালী, আমাদের কাছে সাজবে তো?

ঠাকুর—তা কেন সাজবনি গো, (ভাবস্থ) দে না গো মা, আমায় সাজিয়ে দে, আহা সব সাক্ষাৎ ব্রজগোপী!

গঙ্গা—শুধুই সাজাবি? আমার দুলালীকে কিছু খাওয়াবি না?

১ম—বা: শুধুই বুঝি সাজায়! আমি লাড়ু বোরা সব এনেছি। তোমায় কিন্তু আমাদের কাছে খেতে হবে দুলালী।

ঠাকুর—হ্যাঁ গো তোদের গঙ্গামাঈকে সাজাবি না?

১ম—ওরে তাই তো! গঙ্গা মা যে ললিতা সখী, ওকে না সাজালে কি চলে? তুমি ঠিক বলেছ দুলালী, গঙ্গা মা-কেও আমরা সাজাব, কি মজাই না হবে তাহলে।

গঙ্গা—ও দুলালী, একি করলি বল্ ত'? যা না রে তোরা দুলালীকে সাজা, দেখ্ কেমন মানাবে।

ঠাকুর—ওরা আর ছাড়বেনি। আর তোমার দেহ এখন তাঁর দেহ।

সকলে—না সে হবে না গঙ্গা মা!

(ঠাকুর ভাবস্থ। সকলে সাজাইতে লাগিল পরে উভয়কে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল)।

গীত

এ রূপকুঁয়ার ক্যা রূপ কুঁয়ারী
চন্দ্রা দুলার ক্যা রাধা দুলারী
নিধুবনমে নই নই বহার
মোহন আয়ে গঙ্গাকে দ্বার
মনকে বৃজমে সাজে ফুলবারী॥
বনে ছোটী সি কুটীয়া
প্রীত মহল
বাব্‌রী যমুনা ভরী চঞ্চল
এ গোরী ক্যা বট বাঁশোয়ারী॥

(গঙ্গা মা ভাবস্থ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।)

গঙ্গা—কে বলে ব্রজের খেলা ফুরিয়েছে। এ যে নিত্য বৃন্দাবন, নিত্যলীলা। ওরে ব্রজবাসী ছুটে আয়; ছুটে আয় দেখে যা আমার দুলালীকে দেখে যা; আমার আনন্দ দেখে যা দুলালী, ওরে আমি কি ভাবতে পেরেছিলাম আবার তোকে ফিরে পাব! কিন্তু পেয়েছি রে পেয়েছি।

(লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠাকুর—ওগো মা শান্ত হও দেখি, শান্ত হও। ওঠো ওঠো।

গঙ্গা—আমি যে আনন্দে পাগল হয়ে গেছি, হয় তো মরে যাব গো, মরে যাব।

ঠাকুর—(বালিকাদের) ওগো, ও মা, তোরা নাম কর দেখি তাহলে ভাবটা একটু কমে।

(সকলে নাম করিতে লাগিল, গঙ্গা মা প্রকৃতিস্থ হইলেন)

(হরুর খাবার হস্তে প্রবেশ)

হরু—কি গো মামা, তুমি কি খাওয়া দাওয়া সব ছাড়বে? আমি এমন করে তোমার খাবার কত ব'য়ে আনব বল তো?

গঙ্গা—তুমি নাই বা আনলে হরু, আমিই দুলালীকে খাওয়াব।

হরু—(স্বগতঃ) হুঁ চিরকালটা ত' খাইয়েছেন—দেখ মামা, খাবে কিনা বল?

ঠাকুর—আহা চটছিস্ কেন রে? দেনা কি খাবার এনেছিস্। (হরু খাবার দিল)

হরু—আর এবার তো ফিরতে হবে।

ঠাকুর—কোথায় রে?

হরু—বাঃ সব ভুল বৃন্দাবনে এসে, কলকাতায় গো কলকাতায়।

গঙ্গা—দুলালী, তুমি যেও না দুলালী, আমি কাকে নিয়ে থাকব? না না হরু তোমরা যাও, দুলালী যাবে না।

হরু—না যাবে না। (ঠাকুরকে) চল মামা, তুমি এখনই চল! সেজবাবু তোমায় খুঁজছিলেন।

গঙ্গা—(অঞ্চল হাত ধরিয়া) না যাবে না।

হরু—মামা, তুমি শিগগির চল—

গঙ্গা—না দুলালী, তুমি যেও না।

ঠাকুর—দেখ, গঙ্গামায়ী বড় ভক্ত—ওকে ছেড়ে কোথায়

যাব বল ? আর বৃন্দাবন আমার খুব ভাল লেগেছে আর এখানকার এরা সব কেমন পবিত্র, কেমন সরল, বল্ দেখি।—

হুদু—তুমি এখানে থাকবে। যাবে শোবে কোথায় ?

গঙ্গা—কেন আমি দুলালীর জন্যে সিদ্ধ চালের দুটী করে ভাত রেঁধে দেব আর আমার বিছানা এদিকে হবে আর দুলালীর বিছানা ঘরের ওদিকে হবে।—

হুদু—হুঁ: আর অসুখ ত' তোমার লেগেই আছে, কে দেখবে শুনি এই হুদুর মত ?

গঙ্গা—কেন, আমি দেখব আমি সেবা করব।

হুদু—তবে থাক, আমি চল্লুম সেজবাবুর কাছে। (প্রস্থান)

গঙ্গা—তুমি যেও না দুলালী—তা হলে মরে যাব।—

ঠাকুর—আমার ত' বাপু যেতে মন সরছে না তোমাকে ছেড়ে, বৃন্দাবন ছেড়ে।

গর্ব—ও গঙ্গা মা'র দুলালী ! তোমাকে আমরা জোর বন্ধ করে রেখে দেব, যাবে কেমন করে ?

সকলে—তুমি যেও না দুলালী।

ঠাকুর—আচ্ছা, আজ এখন আসি, হৃদে আবার চটে গেল।

গঙ্গা—দেখ, আমায় ছেড়ে যেও না যেন—

ড্রপসিন

৮ম দৃশ্য

বৃন্দাবনে মথুরের বাড়ী

মথুর ও হুদু

মথুর—তুমি আমায় চিন্তায় ফেললে হুদু। ছোট ঠাকুর কি সত্যিই যেতে চাচ্ছেন না ?

হুদু—তাই তো দেখছি সেজবাবু। আর ঐ গঙ্গামায়ীটি ত' কম নন, উনিও ত' আটকাচ্ছেন ; আর মামাকে ত' আমার জানেনই—

মথুর—তা জানি বলেই ত' ভয়। (স্বগতঃ) ভক্তিডোরে ভগবান ত' বাঁধা পড়বেনই। (প্রকাশ্যে) তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়েছ হুদু ?

হুদু—তা বলব কি সেজবাবু, হাত ধরে টেনেছি ; আর বলেওছি এখানে থাকবে কোথায় ? দেখবে কে ?

মথুর—ছোট ঠাকুর কি বললেন ?

হুদু—বললেন গঙ্গা মাই—কেন ? আমি দেখব, আমার কাছে থাকবে।—ও গতিক সুবিধা নয়, মামার বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে একেবারেই ইচ্ছা নয়।

মথুর—তা হলে যে আমার অত সাধের দক্ষিণেশ্বর অন্ধকার হয়ে যাবে ! ছোট ঠাকুর কোথায় ?

(ঘুরে ঠাকুরের কণ্ঠ।

হুদু—ঐ ত' আসছেন—

(ঠাকুরের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

ঐ রূপ সায়রে ডুব দিয়েছি
ঐ শ্যাম সায়রে ডুব দিয়েছি
আমার ঘর ছাড়ালো পাগল বাঁশী
পরান আমার তাই উদাসী গো
জীবন মরণ কান্না হাসি
ঐ চরণে সব সঁপেছি॥

ঠাকুর—এই যে গো, কি ভাবছ সব ?

মথুর—বাবা, বড় আঘাত পেলাম একটা কথা শুনে, তুমি নাকি বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে না ? বল বাবা, একি সত্যি ?

ঠাকুর—সত্যিই গো, আমার বৃন্দাবন ছেড়ে গঙ্গামায়ীকে ছেড়ে যেতে কেমন যেন মন সরছে না।

মথুর—আমার দক্ষিণেশ্বর তাহলে যে অন্ধকার হয়ে যাবে। না না বাবা, তুমি না গেলে কি হয় ?

ঠাকুর—কে জানে বাপু, গঙ্গামাকে কাঁদিয়ে আমার যেতে ভাল লাগছে না।

মথুর—এতদিন পরে গঙ্গামাই হল তোমার আপন' ? আমরা কি কেউ নই ?

ঠাকুর—কি করবো, মনকে টেনে রাখছে যে—

মথুর—না বাবা সে হয় না, তোমাকে না নিয়ে আমরা কিছুতেই যাব না ; তুমি দয়া করে মত দাও।

হুদু—আর দিদিমা যে দক্ষিণেশ্বরে একা গো ; কে দেখবে তাকে ?

ঠাকুর—তাই তো, মা যে একা ! ঠিক বলেছিস্ হুদু ;

সত্যি ত' আমি এখানে থাকলে মাকে কে দেখবে ? মা বুড়ো হয়েছেন, এই শেষ বয়সে তাঁকে দূরে রাখা ত' চলে না। তাহলে তাঁর চিন্তা আসবে ঈশ্বর চিন্তা চিন্তা সব ঘুরে যাবে। এখন তাঁর সেবার দরকার, কাছে থাকার দরকার। না, আমায় যেতেই হবে। তোমরা তৈরি হও গো সেজবাবু, যাবার আগে গঙ্গা মা'র কাছে হয়ে যাব।

মথুর—বেশ তো বাবা, তাই হবে। নাও দুদু, তৈরি হয়ে নাও আর ভাবনা কি, বাবার আমার মত হয়েছে। আমারও যেন প্রাণ এল।

(প্রণাম)

—ড্রপসিন—

৯ম দৃশ্য

[গঙ্গামার কুটীর

গঙ্গা মা বসিয়া আছেন। মেয়েরা হাসিতেছে।]

গীত

মেয়ে শ্যামলকী প্রীত
না জানে দরদ—না জানে রে রীত
উলকী বাঁশীরা ভি চোর
ও রসিয়া ঠঠোর
বঙ্কবটকে মিত।
আঁধিরা বনে যমুনা
সারে সংসার সুনা
ছায়ে মরণকে গীত।

১ম বালিকা—আচ্ছা গঙ্গা মা, তুমি আজ এত আনমনা হয়ে আছ কেন ?

গঙ্গা—কি জানি মা—আজ আমার কিছু যেন ভাল লাগছে না। হাঁ রে এখনও ত' আমার দুলালী এল না ?

২য় বালিকা—সেই লোকটা কেমন যেন গোলমাল করে দিয়ে গেল। আচ্ছা গঙ্গা মাঈ' তুমি দুলালীকে ছেড়ে দিলে কেন ? যদি চলে যায় তারা, যদি ছেড়ে না দেয়—

গঙ্গা—(শিহরিয়া) চুপ চুপ, অমন কথা বলিস্ না।

(স্বগতঃ)

কি জানি কি আছে আমার কপালে। না না দুলালী আমাকে ছেড়ে যাবে না কিন্তু তবু যেন কেমন একটা ভয় লাগছে।

(প্রকাশ্যে) চল্ তো মা, দেখি আমার দুলালী আসছে কি না।—

(ঠাকুরের প্রবেশ ভাবে গাহিতে গাহিতে, গঙ্গামায়ী নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

গীত

কিরবো এবার মায়ের গাঁয়ে
কিরবো এবার মায়ের পায়ে।
ভরবো এবার চোখের বারি
দুখ সায়রে ধরব পাড়ি
জীবন মরণ শরণ নায়ে।
অনেক চাওয়ায় এই তো পাওয়া
গান হারায়ে প্রাণে ছাওয়া
লুটিয়ে যাওয়া পায়ে পায়ে।

গঙ্গা—দুলালী তুই চলে যাচ্ছিস ?

(ঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন)

ঠাকুর—হাঁ গো মা, আমায় যেতে হবে আর থাকা হল না।

গঙ্গা—আমি—আমি কি করে থাকব ? কাকে নিয়ে থাকব ?

ঠাকুর (মেয়েদের দেখাইয়া) কেন গো, এদের নিয়ে থাকবে। আহা দেখ তো কেমন সরল পবিত্র আর তোমায় কত ভালবাসে।—

গঙ্গা—আমায় ভুলিয়ে যেতে চাস দুলালী

(কাঁদিতে লাগিলেন)

৪র্থ—ও গঙ্গা মা'র দুলালী তুমি থাক না; দেখ তো গঙ্গা মা কত কাঁদছে। আর আমরা কাকে নিয়ে খেলব ?

ঠাকুর—ওগো মা কেঁদনি আমি তো থাকবই ভেবেছিলুম—

গঙ্গা—তবে কেন চলে যাচ্ছ ? আমি কি তোমার যত্ন করতে পারতাম না ?

ঠাকুর—না গো, না, তোমার ভক্তির কি তুলনা হয়—সে তো আমি সবাইকে বলেছি। তবে কি জান, আমার মাকে মনে পড়লো, মা বুড়ো হয়েছেন, আমি ছাড়া তাঁর তো আর কেউ নেই, শেষ বয়সে আমাকেই ত' তাঁকে দেখতে হবে।—

গঙ্গা—আর আমি বুঝি তোর কেউ নই? আমারও যে শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ঠাকুর—মা কি কম জিনিস গা? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আসতে পারলেন। শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বললেন মা, তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না, তবে সংসারে যদি আমায় রাখ আমার শরীর থাকবে না। আর মা, যখন তুমি মনে করবে আমায় দেখতে পাবে। আমি কাছেই থাকব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব। তবে শচী অনুমতি দিলেন।

গঙ্গা—বেশ, তবে আমাকেও ঐ আশ্বাসই দিয়ে যাও যে যখনই আমি ডাকবো তখনই তুমি এসে দাঁড়াবে।—

ঠাকুর—(ভাবস্থ) তাই হবে গো মা, তাই হবে।—

গঙ্গা—আর তোকে বাধা দেব না—না না আর বাধা দেব না—তোর মা কাঁদছে, তুই ঘুরে আয় দুলালী। আমি তো চিরকালই এমনি আছি এমনি থাকব, তবে যা বললাম দয়া করে মনে রাখিস।— (ঠাকুর প্রবেশ)

ঠাকুর—মামা, সেজবাবুদের গাড়ী এসে গেছে গো, এস···

(মথুরের প্রবেশ)

মথুর—বাবা এইবার এস—(গঙ্গামাকে দেখিয়া) একি মা আপনি কাঁদছেন?

গঙ্গা—বাবা, তোমরা আমার দুলালীকে নিয়ে চলে যাচ্ছ। আমার বুক যে ভেঙে যাচ্ছে। আজ কি মনে হচ্ছে জান, ঠিক এমনি একদিন এসেছিল, সেদিন আমার নন্দ নন্দন আমার শ্যামল চলে যাচ্ছিল এই বৃন্দাবন ছেড়ে; আর গোপীরা কি করেছিল জান? সেই পাষাণের রথ-চক্রের তলে লুটিয়ে দিয়েছিল তাদের কানুহারা তনু।— আজ আমারও মনে হচ্ছে তেমনি করে আমার দুলালীর রথচক্রে এই পোড়া দেহটা লুটিয়ে দি। দেখি সে কেমন করে যেতে পারে।

মথুর—মা, আপনার ভক্তি-প্রেমের কথা বাবার মুখে শুনেছি, নিজের চোখেও দেখছি। কিন্তু মা আপনি যাঁর কথা বলছেন তিনি তো মা এক জায়গায় বন্দী থাকেন না; তিনি যে বুকে বুকে তাঁর আসন করে নিচ্ছেন। আপনার হৃদয় রাজ্যে তো তাঁর আসন চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে মা।— আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন?

গঙ্গা—তা জানি, বাইরে সে দূরে গেলেও হৃদয় থেকে সে দূরে যেতে পারেনা, তবু মন যে মানে না। না না আর দেরী করো না বাবা—একটু দাঁড়া দুলালী (একটা মালা আনিয়া পরাইয়া দিল)

ঠাকুর—তবে আসি গো মা, (সকলকে) আসি গো মা রা (সব প্রণাম করিল)

ঠাকুর সব কৃষ্ণে ভক্তি চির অচল হোক।

(কিরব এবার মায়ের গায়ে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

গঙ্গা—(একটু ছুটিয়া গিয়া আছড়াইয়া পড়িল) দুলালী—দুলালী। (সকলে ঘিরিয়া বসিল)

১ম ও গঙ্গা মা, গঙ্গা মা, অমন করে কেঁদ না গঙ্গা মা, ওঠো।

গঙ্গা—(উঠিয়া) না কাঁদবনা, সে ত' বলেছে ডাকলেই আসবে তবে ডাকি, শুধু বুকভরে ডাকি, তোরাও ডাক্, ওরে বুক ভেঙে ডাক্।

১ম—দেখনা গঙ্গা মা, আমরা আবার তাকে ফিরিয়ে আনবই আনব।— (সকলে নাচিয়া গাহিতে লাগিল)

(গীত)

সুনে দিলকে কুঞ্জমে মধু
রাস রচাঈ
তুম আও পদাই মেরে কিশোর পদাই
ছায়ে রাজবনকে সুপন
ওঠে। মে লায়ে চন্দ্রাকে চুমন
হর প্রীতকে রঙ্গসে মেরে কুঞ্জ সজাঈ।
প্রেম গগন মেরে চন্দা ঝিলমিল
নৈনসে সুরধুনী মিলে হিলমিল
অভিসার মে তেরে প্রাণ বটকো নচাই।
আও রসিলে চোর
আও নিঠুর কিশোর
তেরে কমরুম রুম নূপুর সে
হমে দুলাঈ।

—ড্রপসিন—

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

[In the last issue our author discussed two more chapters from A. T. Jersild's "Child Psychology". One was about "Children's Ideals, Morals and Religion" wherein the topics dealt with were moral assumptions underlying child psychology, problems in the moral training, honesty, generosity, children's heroes and religion. "The growth and prediction of intelligence" was the next chapter. The topics dealt with in this chapter, were the Stanford-Binet Scale, intelligence quotient, fluctuation and error in test results, limits of growth of intelligence, influence of nature and nurture, schooling effect on intelligence, effect of schooling, intelligence and family size, gifted children and lower intelligence.]

Personality of a child :

The child's personality is tolality of an individual's behaviour as shown in his conduct, his repetitions, temperament and character as judged by others and the inner organisation of his drives, attitudes and purposes. The components are his objectives measurable characteristics and abilities, his physical characteristics, his body size, and physique, factors in the mechanism and chemistry of his body influencing his speed and energy, his aptitudes, talents, intellectual abilities, manual dexterity, artistic skill, his imaginative capacity, his competence to serve himself and others, his traits, habits, behaviour pattern, characteristic modes, his motives, aspirations, feelings, ideas, attitudes regarding himself, convictions, commitments, purposes and the organisation of his inner life.

Early manifestations :

Among the early expressions of a child we find his consistency which marks each child in spite of his change with years. There are problems of adjustment for a growing child. There are problems for the parents or for school authorities but they may not see it in the light of the child. Many problems persist for a time and then disappears. These are characteristic of a certain level of growth. Varying standards as rated by adults are found but in spite of pain and plea for help, there is something constructive and something of hope in a childs problem. In solving the problem of a child, the adults may find their own problems also. Everyone, in the author's opinion, is, to some extent, maladjusted in one way or other but the important thing is to face the problem realistically regarding the environments, culture etc. of the child.

Knowledge of self, acceptance of self and mental health :

A child of good health can think and feel an inner harmony and integration. Each child is a self understanding and self accepting being. Self understanding means genuineness, truth and forthrightness. It is not being blind or self-deceiving. Self acceptance

means that he can live fairly well with his emotions, is confident about his ability, is willing to accept responsibility with years and has a healthy regard for his rights and with his age he accepts his limitations. He draws on his mental capacities and enters into friendly relations with others. It is not overrating himself. He can make a now and then self criticism. His acceptance means also the acceptance of others. Again understanding of oneself also goes with the understanding of others. His realistic judgement towards himself gives him power to be realistic about others.

A child shows resistance when he is reminded of some feature that he does not care to hear. There are many methods, according to the author, such as putting blame on someone else or to deny that there is any difficulty or he diverts the attention by admiring the qualities he does not possess. A cheating child will put a show of honesty. He may defend himself by ignoring some signs and seizing upon others. He might also provoke others into justifying an attitude. There is another way of defence which is to shift the scene as from class room to the playground where he is extrazealous. In such cases it is better for the elders to think the value of silence.

The language about the self has a wider range than other languages. For example, when we speak of our fear it applies to all levels of age.

Experiences at school, the results and his attitudes, these are prominent factors in a young people's life

Painful emotion, surge of anger, irritability, depression, uneasiness and apprehension are sickness of the self, specially when there is no rational cause behind. These are disorders of personality development. But a child who tries to cope with these in an irrational way enters into more trouble. The elders should, with prudence and facility give opportunity to reveal a child's emotional difficulties and by this child gets a clearer view of himself without distrusting others and resorting to a burden of secrecy. Self understanding is an unending process so long as one lives and others remain about him.

God looks at the working of one's mind. He does not take into account what in particular a person is doing, or where he is lying. The Lord recognises the motive alone.

—Sree Ramkrishna Dev

On Reading "A Sheaf of Waves"

Shailendra Nath Chakraverty

Many swallows do not make a nightingale ; but weather for swallows is weather for nightingales. So, when minor poets are in season, we may hope on occasional major one. And here is certainly a major poet—Sannyasini Sri Archanapuri. *A Sheaf of Waves* is the translation of her Bengali poems published under the title *Kotakgulo Dhew*. Most of her Bengali poems, including the poems in *A Sheaf of Waves* have been translated into English by Sri Jyotsnanath Mallik, himself a man of letters and accomplished literary taste, with great care and sincerity maintaining the charm and sweetness of the original poems. The garden of literature is overgrown with the weed of the amateur ; but fortunately, here is a poet who cannot be called an amateur trying her hand to write poetry for the first time. Sri Archanapuri is much more mature in her craftsmanship than any other poets of today. The days of her apprenticeship, under the able guidance of Srimat Swami Satyananda Dev—who was himself a great scholar and poet—are over and now she has appeared before us as a poet of the first order and merit, a poet of imagination all compact, a seer and singer of rare genius.

Sri Archanapuri has a forceful inspiration, both in respect of imagination and emotional power. It is forceful rather than forcible, influent rather than affluent ; not broad and opulent but straight and intense. Although here whole attention is focussed on God and the Divine, her themes are varied and various—from *A Memorable Midday* to *Grant Peace*.

What distinguishes her poetry is her wonderful abundance of imagery and sweet lyricism. We get very close to the heart of her genius in her poetry, and can confidently claim for her the title of a great poet. She has constant and intimate touch with Nature and she has the power of painting a fine natural scenery. A few instances may suffice here :

"I see light sparkling on the wings of a
flock of pigeons,
the wintry wind weaves thrills on the
feathery screen.
I see from a distance a butterfly reposing
secret feelings
in the ears of a small blue flower."
(*Run Away With Yourself*)

Or,

"A flock of butterflies
Opening wings in the wind"
• •
Let white clouds sail
In silvery veils ;
Like the mind adrift
Swim the wings of the swan"
(*Hope And Imagination*)

Or,

"....the fallen leaves of Chaitra are blown
away
by new Baisak's southwesters.
The old weariness in north-east clouds
in thunder-horn-peals,

the journeys' route towards sunrise
paves in renewed glories."

(*The Beginning And The End*)

There is the variety, as well as the freshness of her natural magic. She is also the poet of Indian seasons—summer, rainy, autumn, winter and spring and each season is represented by a Bengali month, e. g. Baisak for summer, Shravan for rainy, Falgoon for spring. She has many pictures, all distinct from each other, and all perfect, of every Indian season. A noon in the summer heats attracts her attention no less than a day in the winter. Here is the picture of the arid atmosphere of a midday in Baisak :

"I notice– the flower-stalk is withered,
the honey yields no colour
the faded foliage has turned yellow,"

(*A Memorable Midday*)

and here is the atmosphere of a day in winter when

"...the Kunda white moonbeam was not
in the sky,
the Henna fragrance in the Bakul breeze
did not fly,
only a handful of mist-sprayed
cold moments of langour...."

(*Mother Alas Has Gone Back Silently*)

And when the spring season sets in with the advent of Falgoon the poet bursts forth into an ecstatic joy :

"That spring is awake at the door
like the harbinger of a golden existence.
In its golden casket of dreams lie hidden
the gems and pearls of many a lost age."

(*Here Is That Falgoon*)

The poet's treatment of Nature is a blend of several threads. Sometimes it shows her inquisitive mind, as in these lines :

"One Baisakh evening at the horizon's
flank
Longingly draws the drawings of the
moon
Another rainy day in unaesthetic mind
Wipes out in cruel hand that artistic ken
Which has meaning?"

(*Who Will Answer ?*)

Or, it reveals her own sorrows and joys, as in this stanza :

"The morning sky with pigeons on wings,
light seeping down,
in the face of distant fragments of
motionless green patches
the motion of ups and downs of life
along the uneven road,
all around are scattered heaps of stones,
they are the smiles and tears of mine."

(*What I Want*)

or again, it expresses her longing for intimacy with Nature :

"The grass knows guessing the tale
of the stone,
The river searches listless the surge
of the sea,
there is my sport.
Floating life's raft,
Not here not here"

(*Not Here Not Here*)

or further, it proclaims her conviction that Nature is merciful :

"Do not think that between the earth and
the sky
the great void is merely an empty
questioning,
a shower of gentle harmonic rain is its
answer"...

(*Who Is That Traveller ?*)

The poet can make each page fragrant with *bakul*, jasmine and rose, and at the

same time, she can decorate it with a beautiful landscape.

However, Sri Archanapuri is not primarily concerned to describe the external Nature, but to express an imaginative vision of all things as alive, as connected and as the art of God. She cannot be called a Nature-mystic in the strict sense of the term but she has a mystical insight in the sense that the beauties of Nature raise her thoughts and feelings to the Divine Artist, the Author of those beauties. This mystical insight seems to have deepened by her own intuitive power and strengthened by the teachings of her Guru Swami Satyananda Dev. She has an intuitive power by which she sees the secret identities of essence in outwardly separate things and she wants to write a poem uniting all the diverse objects in the external world. But presently a greater truth flashes upon her mind and she realizes that there is a more competent and perfect artist than she is and He is God. He is already at His work. She further realizes the futility of her efforts to write a poem in which she wants to bring about a harmony in the seemingly discordant objects in Nature. So she finally decides to pass her pen on to Him :

"But I see while trying to unite in rhyme,
there is no sleep
in the eyes of the eternal poet,
in sleepless eyes he is harmonising all
that is discordant
in complete concord.
Then what more ! Why not pass on
This pen to him."
(*A Memorable Midday*)

The poet, here, is not anxious about her own glory. Her ego is reduced to zero in order to heighten the glory of God !

Both the mystic and the poet are engaged in a service of joy ; the mystic through his prayer, and the poet through his creation. For the artist's creative activity, reflecting and reproducing the glory of God, like the Divine Creation, which in a true sense it completes, reproduces somewhat of the Creator's joy in His work. The poet touches the Divine Creator by his poetic art, and he is endowed with a creative vision that makes him the "maker", since in poetry the spirit becomes incarnate and the body becomes instinct with spirit. And when the body becomes instinct with spirit it hears an unuttered music :

"From the other side of the finite sky
perhaps an eternity has broken silence,
that is what is unuttered music !"
(*Advent of Immortality*)

The human spirit enters the land of eternity when the barrier of the body is demolished and it experiences the existence of an infinite and unseen realm of self-realization and truth :

"We are men of clay.
With faces upward whom do we invoke—
Whom ?
An unseen truth.
Only a realization in the heart of heart,
a soft pulsation,
which I spy not but exists." (*Eternal*)

And when the poet's mundane taint is covered up by a mystical illumination, she wants eagerly

"....to hear with eager ears
the murmurs of the celestial river."
(*What I Want*)

and finally she prays :

"Oh my guide, it is on that day to be
fulfilled

the love of the infinite in finite heart."

(*Ibid*)

The poet, here, wants to capture the intangible love in the tangible form. Abstract becomes concrete. The unseen becomes the seen :

"He comes.
That unseen of the unknown
appears at the border of the seen."

(*Eternal*)

The poet does not want to mystify the reader and so she adds a human flavour to her spiritual realization and mystical experience. Her spiritual-homesickness is revealed through the memory of Swami Satyananda Dev, or Swami Abhedananda, or Sri Ramkrishna, or Sri Ma Saradamani. It is vibrant and aglow in these lines :

"I shall say O' you unseen, you were there
you are here today, you shall be hereafter.
Which is truth in the knowledge of the
unseen,
in the seen, that is an embodied delight.
At the conflux of the form and the
formless

(*Eternal*)

Or,

"The rhythm is as if a vast monometer....
this rhythm causes no disillusion of
direction....
whose one-way voice
calls towards the One
who is that traveller ?
Abhedananda.

(*Who Is That Traveller ?*)

Or,

"No more the fire,
now is to be kindled the light,
the light that will not burn the wings of
millions of moths,
the golden lotus of bliss will bloom.
Not fallen leaves—this spring demands
the signature of blooming flowers
that shall be attested by the advent-hour
of the god
of this epoch,
and that ever-old eternal Panchabati."

(*Here Is That Falgoon*)

Though the poet, Sri Archanapuri, lives among soaring ideas and impalpable abstractions, she is fully at home in the visible world, if only because it is a mirror of eternity and worthy of attention for that reason. Sri Archanapuri, again, holds that the imagination is a divine power and that everything real comes from it. Her true home is in vision and for her the imagination uncovers the reality masked by visible things. In the poem *The Past*, the poet tells us that the seed of eternity is hidden in the ruins of the past :

"Past I am still I survive
I am not dead
Wrapped round the dangling roots of
ancient banyan tree
I am the old manuscript
I am in the hands of eternity held."

The ruins of the past, the realities of the world, are quite visible :

"The walls have fallen
Those ruins in pile
look on supine
The breath of snakes has blackened
the crevices in brick
Layer by layer the dust of ages
has collected thick."

Through visible things Sri Archanapuri reaches that transcendent state which we call "eternity" and feels free to create new worlds :

"The demand of eternity of existence
in my limitless silence resides
know that the eternal motion of the new
star
at my ancient sky's bidding
forever motionless abides."
(*The Past*)

She is not a mystic striving darkly and laboriously towards an enchanted land of illumination, but a visionary who can export to the people of the world :

"Run away from this world with yourself
far off—far away,
you will find the Joyland of imagination
in the palm of your hand."
(*Run Away With Yourself*)

Here, her attention is turned towards an ideal, spiritual world, which with all other selves who obey the imagination she helps to build. Imagination for her is synonymous with the Divine vision, because for her the imagination creates reality and this reality is the divine activity of the self in its unimpeded energy

If Sri Archanapuri comes nearer to the Blakean, Wordsworthian and Coleridgean idea of the imagination, she equally shares with Browning his philosophy of optimism. Man is anxious to know the reason behind all the workings of God. He is baffled to see paradoxes and contradictions in the world. He asks in vain : why this is this or why this is that ? He is, at the same time, at a loss to understand God's pattern of action. Sri Archanapuri gives vent to this feeling adequately in the poem *Who Will Answer*. Moreover, man has to face disillusionment some day or the other ; but that is not final and conclusive. Sri Archanapuri, like Browning, believes that nothing is meaningless in this world and that a soul can be healed of its failings through the grace of God by faith and love. Our sorrows, fears, doubts and misgivings disappear when we realize the truth that

"Nothing was meaningless
getting the opportunity of the unspoken
with hesitancy's golden key
the unfamilar's door could not open
in fear unknown."
(*Disillusionment*)

We can arrive at a safe destination if we have certitude of faith :

"Today I find all storms and waves
have pushed towards the shore,
there that unvisited green bank
appears to have come closely more
for I have known sure."
(*Ibid*)

Further, a life of peace and tranquillity is attained by an unconditional surrender to the will of God and self-analysis :

"If you once turn towards
your own self
if you cast the mask and
take your breath,
the false entries of debit and credit
that stand
tearing them off if you before God
forgiveness demand.
Oh life the meaning of living
you will not miss,
crown with success your death
in eternal bliss."
(*To Life*)

Spiritual, like normal growth, is normally gradual, and if it continues, and comes like the dawn of day. We can recognize the darkness of night and the rays of the sun, but who can say when night passes into day ? Objects loom up, trees can be identified, colour begins to show, yet it is still not

light enough to read. Light comes through the grace of God and the grace of God comes through sincere prayer—the prayer of quiet. Sri Archanapuri sums up her spiritual pilgrimage with a sober prayer :

"……I discover
another mind
that wants only to forget
wants to plunge in the unruffled invocation of peace
from depths to deeper depths
and wants no more to float.
So looking at the moon
I wanted to see another picture
in beauty drawings of well-being and amity,
whose background is entirely composed
And at the feet of the Lord of innermost being keeps awake
one prayer—grant peace. (*Grant Peace*)

The sanity of Sri Archanapuri as a thinker is well-matched by her dexterity as an artist. She is fully aware of those qualities which make poetry important in itself. Her craftsmanship reveals the depth of her thought and her power to express it most felicitously. Her use of personification, figures of speech and imagery is, at times, to deck her thought as well as to give her abstract ideas concrete forms. Here is a fine picture in *A Memorable Midday* :

"Like black dots
two men passed post haste across."

It is a picture of a naturally vocal sensibility in contact with the world and it appears as if the picture were taken in a movie camera. Equally commendable is her power of painting pictures based on the sense-data. Here is the sense of touch :

"—the poem like a piece of soft ice…"
(*A Memorable Midday*)

and here is the sense of sight :

"Look at the sky from the ground,
it's like a blue poem ; "
(*Run Away With Yourself*)

and here is taste :

"Not poison alone in the black pool of life
Ambrosial southwind thrills both its banks." (*Glad Tidings*)

and here is smell :

"…so I ask why
in incense offering don't you get the perfume…"
(*To Life*)

and here is hearing :

"Where the sky is touched in song after song
Where the stars talk in whispers,
there is my road."
(*Not here Not here*).

Further, Sri Archanapuri is well-adept in the use of "Colour-Hearing", for instance :

"The sky blows the conch of light,
in the heart of the earth's green
descends a golden echo
the tread of a tender foot."
(*Eternal*).

Again, mark her use of onomatopoeia to produce a sound-effect :

"I want to hear with eager ears
the murmurs of the celestial river "
Or, (*What I Want*).
"The flower and the beam softly murmured"
(*Earth And Mind*).

The poem *Evening Oleander* is a work of great art. It should be read by the lovers of poetry to appreciate the poet's use of apt personification, imagery and felicitous but condensed phrases. The poet achieves, in this poem, the maximum of effect with the

minimum of effort. For final dainty, listen to these splendid lines :

"No shadows of her on moonlight's night
canvas moor
But I have seen her empty hands both
bashfully droop.
Standing at the temple gate in blood-red
robes of renunciation
In her vesper looks gleams the departing
day's oblation."

The lyrical virtue of Sri Archanapuri is so deep and instinctive that her thought itself is lyrical. Its power is in its detached and visionary moments as well as in its ordered sequences. At her best the poet has a homely fidelity to outward Nature, and a sense of felicitously descriptive phrases. Occasional provincialisms, often a pictorial kind, lend colour to her lines. Though a modern poet, she is surprisingly free from the accursed modern trick of hyperbolic enthusiasm and absurd conceits. Her emotion, so sane and strong, takes the reader in confidence Her poetry is noticeably bright and verse-coloured; but though coloured verse, it does not suffer from a poverty of deep thought and feeling It has sufficient substance in it as well as closeness, force and power of expresion : Her sense of form and symmetry is trained and delicate ; and within its range and kind her music is generally sweet, fluent and spontaneous. She has a finished *technique* and diction, entirely adequate to what she attempts and her taste is admirable. Sri Archanapuri is a sannyasin and deeply saturated with the religious and spiritual fervour but she is, at the same time, a worshipper of Art. However, she is not a worshipper of Art in the decadent sense of the term ; rather she follows the Aurobindonian concept of Art. "Art for Art's sake certainly," said Sri Aurobindo, "Art as perfect form and discovery of Beauty ; but also Art for the soul's sake, the spirit's sake and expression of all that the soul, the spirit wants to seize through the medium of Beauty." Sri Archanapuri's *A Sheaf Of Waves* makes a pleasant reading since it combines both the spiritual ardour and the cult of Art in such a harmony that it appears as a thing of beauty, all for our joy.

VEDACHHANDA (Third part)

Sree Sree Thakur

10. To accord proper respect to Thakur, to know Thakur, one has to be the same as Thakur.

So it is said, "The knower of Brahman becomes Brahman."

11. Nothing is needed for the grace of Thakur. Grace is eternal and we are receiving the grace all the time. But when we want that grace to conform to our desire we have to pray or perform austerity. That is, He may grant unto us the grace according to our liking.

[*Translated by S. N. Sanyal*]

Fundamentals of Shakta-Sadhana

S. N. Bagchi

(Formerly a Judge of the High Court, Calcutta)

(5)

The absolute power, the Kundalini-Mahamaya, is such a consciousness as that mind cannot touch : its speech mind cannot utter, nor can reveal its thought. It has no home on earth, no centre in man. Yet this consciousness is the source of all things thought and done, and the fount of the creation and its works. It is a channel for the little, man tastes of Bliss. This consciousness is the Eternal's luminous power otherwise known in Saktagam Tantra Kundalini-Mahamaya—the Cit-Sakti, the great deliverer of man's earth bound mind and the high transfigurer of the human clay. This conscious absolute power, as Sree Aurobindo call it, "Eternal Supermind" when awaken in the human body by Mantra-Sadhana and or by the process of the integrated Hatha-Raja Layayoga wakes in mortal man a superman that grows into the God-Light and God Force, revealing the secret deity in the cave. Sree Aurobindo describes such a superman with supermind, awakened in him, as : —

"The Super mind shall be his nature's fount,
The Eternal's truth shall mould his thoughts and acts
The eternal truth shall be his Light and Guide" (Savitri 706. 1970)

Such a supermind on earth in the historical past was awoke in the superman, Lord Ramkrishna Paramhamsa of Dakshineswar, a suburb of Calcutta and his mortal coil was transfigured into a channel for the expression of Eternal's Luminous power of Blissful consciousness, here on earth, when in ecstatic trance he cried out "Ma, Ma, Ma"—"The Mother". His Sadhana in Mantra Shastra of Sixtyfour Tañtras revealed to him Spirit's Light and Might. He felt in his body the spirit's touch and his life obeyed an inner force. He became a body of superconscient's truth and a field of supernature's might. In the way of his Sadhana for experimenting with the truth of sixty four Tantras i.e. Mantra Shastra of the Agam, and for realising the same, his mind became a God-Vision's tabernacle, his body intuition's instrument, and his life, a channel for God's visible power, and a capital of Bliss. He is one of the greatest of the present age scientists in the domain of the Religion of Power, i.e. Sakta-Dharma, who not only argued but also successfully experimented with the doctrines of Saiva-Sakta-Vaisnagam Tantras, and realised through such doctrines the Vedantic Truth in Adwaitabad i.e. Monism.

[To be continued]

বহু আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থ প্রকাশিত হল

সাধনাপুরীর সঙ্কলিত

গীতার বাণী (২য় খণ্ড)　　মূল্য ২০·০০

(শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অভিনব ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সহ বিভিন্ন আচার্যগণের ভাষ্য সম্বলিত অপূর্ব ভাগবদ্ গ্রন্থ)

শ্রবণ-মঙ্গলম্ (৩য় খণ্ড)　　মূল্য ১২·০০

(শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতময় কথার চয়ন)

প্রাপ্তিস্থান : ১। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ (ফোন : ৫৬-২৭৭০)
২। ন্যাশানাল পাবলিসিং হাউস,
৬৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

সদ্য প্রকাশিত
শ্রীঅর্চ্চনাপুরীর নতুন বই

সারদা-তত্ত্ব　　মূল্য ৩·০০

শ্রীশ্রীমার মানবলীলায় মাতৃশক্তির বিকাশ ও ভাবজীবনের তাত্ত্বিক স্বরূপের মধুর বিশ্লেষণ

কতকগুলো ঢেউ　　মূল্য ৫·০০

উচ্চভাব ব্যঞ্জনাময় দিব্য কবিতাবলি।

প্রাপ্তিস্থান : ১। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬　(ফোন : ৫৬-২৭৭০)
২। ন্যাশানাল পাবলিসিং হাউস,
৬৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

বিঃ দ্রঃ—শ্রীঅর্চ্চনাপুরীর অন্যান্য পুস্তকাবলির তালিকা উপরে উক্ত ঠিকানায় সংগ্রহ করুন।

Telegrams 'COTFIB' Telephone : 22-0737

EAST INDIA COTTON MANUFACTURING CO. LTD.

38, Netaji Subhas Road

Calcutta-700001

Manufacturers of high quality printed Sarees, Printed Dress Materials and high quality Dyed Cambrics and popline.

———

Selling Agents and Authorised Dealers all over India. For details, please write to us at Faridabad.

Mill : New Industrial Township, Faridabad

"SAFEX" LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (5 Lines)

WORLD PHILOSOPHY

by

Swami Satyananda

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M. A., Ph. D.

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৩৪-২০৮১। মুদ্রাকর ও প্রকাশক-স্বামী উমানন্দ

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য ডাঃ ৮·০০

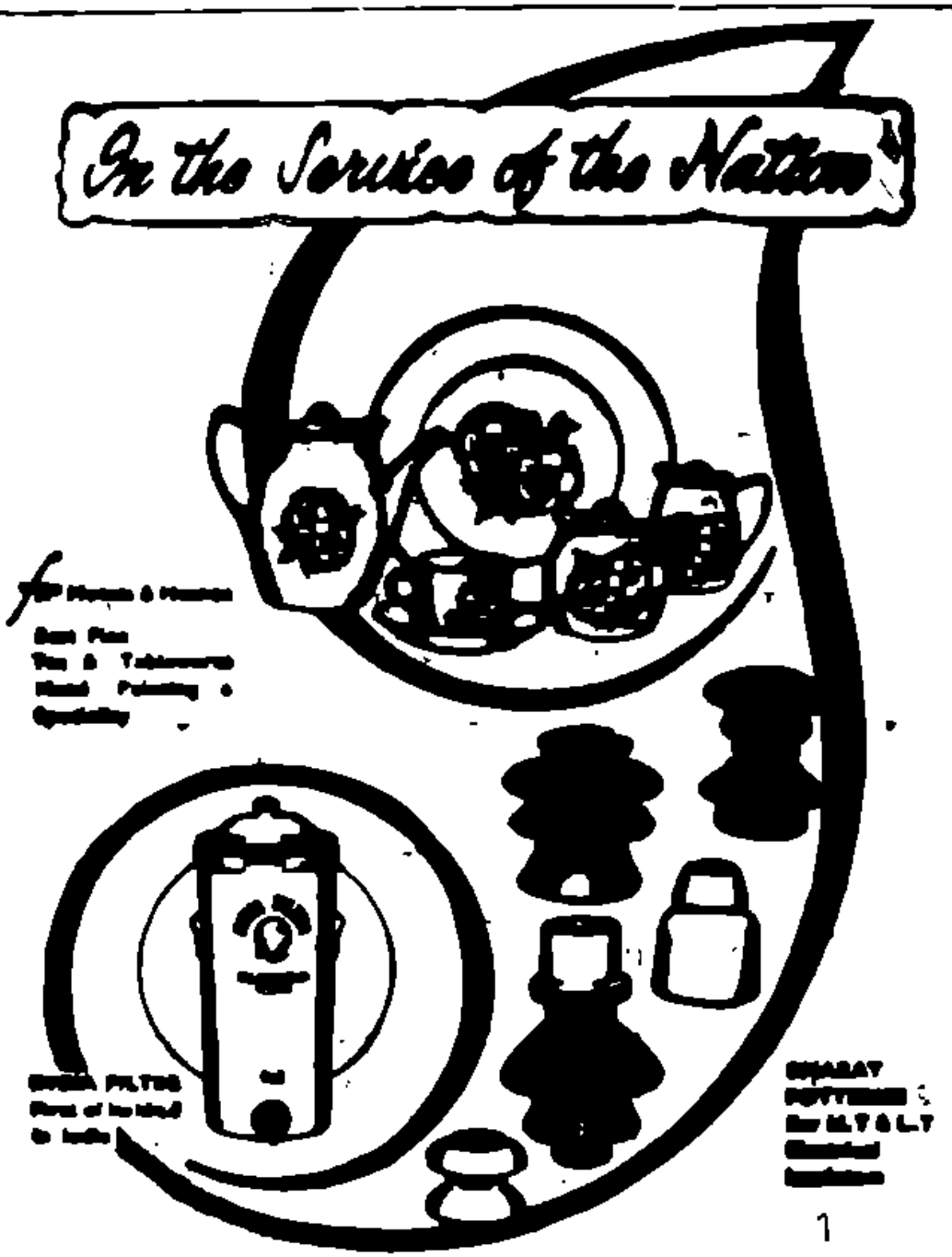

INDIA POTTERIES LIMITED

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

প্রচ্ছদ-শিল্পী : -ব্রঃ: তারক চৈতন্য মুখ-পত্রিকা সচিব—স্বামী অরূপানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। মুখ-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ-সম্পাদক—স্বামী বীরানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ। প্রচার সচিব—স্বামী সদানন্দ, স্বামী তত্ত্বেশ্বরানন্দ, স্বামী অমলানন্দ ও ব্রঃ তারক চৈতন্য।